ISSN-0971-8435

# যোজনা

ধনধান্যে

আগস্ট ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

# সকলের জন্য বিদ্যুৎ

ভারতের শক্তিক্ষেত্র : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
অনিল রাজদান

স্থায়ী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ভারতের শক্তিক্ষেত্র
ড. ঋতু মাথুর

গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ : হালহকিকৎ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ
শিরীষ এস. গরুড় ও প্রেরণা শর্মা

ভারতে শেল গ্যাস ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা
অনিল কুমার জৈন ও রাজনাথ রাম

ফোকাস

ভাবমূর্তি ব্যবস্থাপনা :
পরমাণু শক্তির বিকাশে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ
শ্রীকুমার ব্যানার্জি

বিশেষ নিবন্ধ

জাতীয় সৌর মিশন :
সৌরশক্তিতে ভারতের অগ্রগতি
অরুণ কুমার ত্রিপাঠী

# সৌর শক্তির প্রসার

বিশ্বজুড়ে সৌর শক্তির প্রসারের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স—আই এস এ)-এর শাখার সঙ্গে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে। সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্টার জন্য চিহ্নিত প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল :

ক) লগ্নির বিকাশের জন্য রূপরেখা তৈরি ;

খ) ঋণপ্রাপ্তির জন্য আস্থা বৃদ্ধি (ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট), আর্থিক সুরক্ষার খরচ/বর্তমান ঝুঁকি (হেজিং কস্ট/কারেন্ট রিস্ক) হ্রাস, দেশীয় মুদ্রায় বন্ড জারি করার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থ জোগানোর জন্য সৌর শক্তির বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়ক আর্থিক উপকরণ (ইনস্ট্রুমেন্টস) গড়ে তোলা ;

গ) আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সৌর শক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও জ্ঞান হস্তান্তরের মাধ্যমে সাহায্য করা ;

ঘ) বর্তমান ভর্তুকি-যুক্ত ঋণদান প্রকল্প বা প্রয়োজন হলে নতুন ন্যাস বিধির মাধ্যমে আর্থিক তহবিলের ব্যবস্থা করা ; এবং

ঙ) 'রিনুয়েবেল এনার্জি—গ্লোবাল ইনভেস্টার্স মিট অ্যান্ড এক্সপো' RE-Invest (RE = পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি)-কে সমর্থন করা ; উপরন্তু, সব পক্ষই অন্যান্য বিষয় ও ক্ষেত্রে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করবে।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সৌর জোটের শাখার এই যৌথ ঘোষণাপত্র সৌর শক্তির জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সৌর জোটের বিপুল হারে সুলভ সৌর শক্তির প্রসারের লক্ষ্যমাত্র পূরণ করার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে যে এক লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের প্রয়োজন, বিশ্বব্যাংক সেই লগ্নি টানতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক সৌর জোট এক বিশেষ মঞ্চ যা জোট-ভুক্ত দেশগুলির সৌর শক্তির ব্যবহার ও প্রসার সংক্রান্ত যৌথ উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করবে। লগ্নির অর্থ জোগানোর ব্যয় হ্রাস ও সৌর শক্তির প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের অবিলম্বে বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির খরচ কমানো, সুলভ মূল্যে সৌর শক্তি সর্বজনীনভাবে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে যে একলক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের প্রয়োজন, তার জন্য আর্থিক সংস্থান করা, এবং প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি সংরক্ষণ ও উচ্চমানের প্রযুক্তি-সহ ভবিষ্যতে সৌর শক্তি উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করার মতো অভিনব ও সমন্বিত প্রয়াসের কথা সদস্য দেশগুলি প্যারিস ঘোষণাপত্রে যৌথভাবে স্বীকার করেছে।

আন্তর্জাতিক সৌর জোট প্রথম আন্তর্জাতিক তথা আন্তঃসরকারি সংগঠন যার সদর দপ্তর ভারতে অবস্থিত। ২১২-টি সদস্য দেশে সুলভ ও পরিবেশবান্ধব শক্তির এক নির্ভরযোগ্য ও অমূল্য উৎস হিসেবে সৌর শক্তির প্রসার করতে এই জোট অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে গুরগাঁও-এর গোয়ালপাহারিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোলার এনার্জি (NISE)-র প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সদর দপ্তরের ভিত্তি প্রস্থ ও অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপন করা হয়।

ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সদর দপ্তর গড়ে তোলার জন্য NISE চত্বরে ৫ একর জমি দান করেছে, এবং আগামী ৫ বছরের ব্যয়-সহ জোটের আর্থিক তহবিলের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

আগস্ট, ২০১৬

# যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬


- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

**প্রচ্ছদ নিবন্ধ**

- ভারতের শক্তিক্ষেত্র : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — অনিল রাজদান — ৫
- স্থায়ী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ভারতের শক্তিক্ষেত্র — ড. ঋতু মাথুর — ১৪
- শক্তি সুরক্ষার পথে উত্তরণ — অধ্যাপক শান্তিপদ গণ চৌধুরী — ১৮
- গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ : হালহকিকৎ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ — শিরীষ এস. গরুড় ও প্রেরণা শর্মা — ২২
- ভারতে শেল গ্যাস ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা — অনিল কুমার জৈন ও রাজনাথ রাম — ২৬

**বিশেষ নিবন্ধ**

- ভাবমূর্তি ব্যবস্থাপনা : পরমাণু শক্তির বিকাশে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ — শ্রীকুমার ব্যানার্জি — ৩৪
- ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রেক্সিট-এর ওপারে — ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায় — ৪৩
- জাতীয় অর্থনীতিতে GST-র সম্ভাব্য প্রভাব — ড. বিবেক রায়চৌধুরী ও ড. তৃপ্তেন্দুপ্রকাশ ঘোষ — ৪৬

**ফোকাস**

- জাতীয় সৌর মিশন — অরুণ কুমার ত্রিপাঠী — ৫২

**নিয়মিত বিভাগ**

- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা — ৫৬
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৫৭
- যোজনা ডায়েরি — ওই — ৫৮


**গ্রাহক মূল্য** : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

**প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।**

**পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।**

# এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

## সকলের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ও শক্তি স্বনির্ভরতা

ভারত যখন স্বাধীন হয়, সে সময় দেশের ঘরে ঘরে আলো জ্বালানোর মতো পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধ্যা নামার পর অন্ধকার দূর করার একমাত্র উপায় ছিল লণ্ঠন আর বাতি। বেশির ভাগ বাড়িতেই সূর্যাস্তের আগেই সমস্ত কাজকর্ম সেরে ফেলা হ'ত, আর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ত। কারণ, আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন কেরোসিন তেলের এবং তা ব্যয়বহুল তো বটেই, দুর্লভও। যাদের ঘরে ফেরা বাকি তাদের অপেক্ষায় বা পথিকদের পথ দেখানোর জন্য জানালার পাশে ছোট্ট বাতি জ্বালিয়ে রাখা হ'ত।

স্বাধীনতার পর ছ'দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। রাস্তার ধারের আলোর নিচে বসে কোনও বাচ্চা পড়ছে, এ দৃশ্য আজও চোখে পড়ে বটে, কিন্তু তা ব্যতিক্রম। পরিস্থিতি এখন আক্ষরিক অর্থেই 'অনেক বেশি উজ্জ্বল'। শহরাঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৯ কোটি ২৮ লাখ ০৮ হাজার ১৮১-টি পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে গেছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই 'শক্তি পর্যাপ্ততা' (এনার্জি সাফিশিয়েন্সি) অর্জন করার জন্য আমাদের নীতি প্রণেতাদের সুপরিকল্পিত ও অবিরাম প্রচেষ্টারই ফসল এই সাফল্য। আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক দশক তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়। তা সত্ত্বেও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ার ফলে ভারত তখনও পেট্রো-পণ্য ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। পেট্রো-পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ নির্ভর করত পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর, এবং প্রবল অস্থিরতার জেরে ভারতের আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যের উপর ব্যাপক চাপ পড়ছিল। তখন নীতি প্রণেতারা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতাশীলতা কমিয়ে আনার জন্য বিকল্প হিসাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির কথা ভাবা শুরু করেন। ভারত থোরিয়াম ধাতুর বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ বলে বিকল্প হিসাবে পারমাণবিক শক্তির কথা বিবেচনা করা হয়। অবশ্য, আন্তর্জাতিক তথা রাজনৈতিক চাপ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ-জনিত কারণে ভারতে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ অনেক বছর থমকে ছিল। সাম্প্রতিক কালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত এই অসম্পূর্ণ কাজ আবার আরম্ভ করতে পেরেছে। এ জন্যই ভারত আজও কয়লা ও জল বিদ্যুতের মতো চিরাচরিত শক্তির উৎসের উপর নির্ভরশীল।

যোজনা

অচিরাচরিত উৎস থেকে শক্তি আহরণ করার জন্য ভারত সরকার একটি পৃথক মন্ত্রক স্থাপন করেছে। 'নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক' নামক এই নতুন মন্ত্রকটির দায়িত্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মপরিকল্পনার কার্যবিধি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। একদিকে বায়ু শক্তি, আর কিছুটা হলেও সৌর শক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে, অন্যদিকে বায়ো-মাস (জৈবভর) থেকে উৎপাদিত শক্তির ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবুও কয়লা ও জলের মতো প্রথাগত শক্তি উৎসের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলে এগুলির উপর নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ রূপে কমিয়ে ফেলার আগে এই ক্ষেত্রে আরও অনেক পথ চলা বাকি।

৫৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তার ভাষণে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, 'শক্তি সুরক্ষা—অর্থাৎ, আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সব সময়ে সুলভ মূল্যে জীবনের চালিকাশক্তি (বিদ্যুৎ) সরবরাহ সুনিশ্চিত করা—একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী প্রয়োজন এবং প্রগতির পথে একটি আবশ্যক পদক্ষেপ। কিন্তু এটিকে শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনের কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। আমাদের আসল লক্ষ্য শক্তি স্বনির্ভরতা (এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স)—এমন এক বলিষ্ঠ অর্থনীতি যা তেল, গ্যাস ও কয়লা আমদানির থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।' শক্তি ক্ষেত্রকে আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি এই লক্ষ্য আগামী ২৫ বছর, অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি ঘরে সুলভ মূল্যে ২৪ × ৭ বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

আমাদের নীতি প্রণেতারা যখন শক্তি পর্যাপ্ততা ও শক্তি স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্য সফল করতে কঠিন পরিশ্রম করছেন, তখন এটা আমাদের, অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব, এই প্রচেষ্টা সফল করতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। আমাদের উচিত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উপকরণ ব্যবহার করা, বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা (ফাঁকা ঘরে বা খালি বাড়িতে যাতে লাইট-পাখা না চলতে থাকে তা সুনিশ্চিত করা), বাতানুকূল যন্ত্র ও কৃত্রিম আলোর ব্যবহারের পরিবর্তে বাচ্চাদের প্রাকৃতিক বাতাস ও সূর্যালোক কাজে লাগাতে শেখানো। এই সব ছোট ছোট পদক্ষেপই আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সাশ্রয় করার মাধ্যমে 'সকলের জন্য শক্তি'-র উদ্দেশ্য সফল করার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ❑

# ভারতের শক্তিক্ষেত্র : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

*দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে শক্তির জোগান দেওয়াটা রীতিমত চ্যালেঞ্জিং। সীমিত শক্তিসম্পদের ভাণ্ডার, চিরাচরিত উৎসগুলি থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর আশঙ্কা—এই সব বাধা-বিপত্তি নিয়েই এগিয়ে চলেছে দেশের শক্তিক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মসূচি। এ দেশের শক্তিক্ষেত্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন—***অনিল রাজদান**

দেশের উন্নতি, আর্থিক বিকাশ, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য মোচনের পথে শক্তিসম্পদের ব্যবহার এবং সুলভ মূল্যে এর জোগানের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থালী, চাষবাস, কলকারখানা, অফিস-কাছারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও নির্মাণ ক্ষেত্রে শক্তির যে প্রধান ভূমিকা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিকভবেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রধান জায়গাটাই আজ দখল করে নিয়েছে এক নিবিড় অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ। শক্তিসম্পদের অভাবে দেখা দেয় দারিদ্র্য। প্রায় দু' দশক আগে অনুপ্রেরণামূলক একটি স্লোগান বানিয়েছিলাম আমরা—'সকলের জন্য বিদ্যুৎ'। বর্তমানে এই স্লোগানটিকেই একটু বদলে আমরা করে নিয়েছি 'সকলের জন্য ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুৎ'। খুব শীঘ্রই এই স্লোগানে আরও পরিবর্তন আসবে। এর পরের স্লোগান হবে 'গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ'। তারপরে হবে 'পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ'। স্লোগানের ভাষায় এই পরিবর্তনই বুঝিয়ে দেয় কতটা সাফল্যের পথ আমরা অতিক্রম করেছি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কতখানি?

উপার্জন, শিক্ষা, সচেতনতা ও বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি তথা জনবিন্যাস পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারের দরুন উন্নয়ন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাই এখন বদলে গেছে। এখন শুধুমাত্র উন্নয়ন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার বদলে দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ ও দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের কথাই গুরুত্ব পায় এখন।

বর্তমানে প্রচলিত উৎসগুলি থেকে বাণিজ্যিকভাবে শক্তি উৎপাদন-সহ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক স্বাধীনতার অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করেই এখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, এখন নির্মল বায়ু ও পরিশ্রুত জল পাওয়ার মৌলিক অধিকার মেটানোর দায়িত্বও রাষ্ট্রের। বিশ্বের শক্তি সংক্রান্ত কর্মসূচির সঙ্গে এই অধিকারগুলি মানানসই। কারণ এই কর্মসূচিতে সমতা ও দক্ষতার পাশাপাশি পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নানান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের প্রশংসনীয় কর্মসূচিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যয় ও সুলভে জোগানের প্রসঙ্গগুলি চলে আসে। কিন্তু দুভার্গ্যবশত শক্তিসংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রকল্পই মূলধননিবিড়। এগুলির প্রস্তুতিতে এবং এগুলি থেকে অর্থ ফেরৎ পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌরশক্তির দাম নাটকীয়ভাবে কমায় একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তা অবশ্যই একটা সুসংবাদ। কিন্তু এখনও শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। আশার পাশাপাশি একটা উদ্বেগের বিষয়ও রয়েছে। এ দেশে আশানুরূপ হারে বিদ্যুতের চাহিদা না বাড়ায় উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। উৎপাদনের চাহিদা হ্রাস এবং বিতরণ ক্ষেত্রের ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হওয়ার দরুন চাহিদার বিষয়টি চাপা পড়ে থাকতে পারে। দক্ষতা বৃদ্ধি বা চাহিদার দিকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্যোগের ফলস্বরূপ এই বিষয়টি ঘটলে আনন্দিত হওয়া যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু উৎপন্ন বিদ্যুৎ বিক্রি না হলে বা গ্রাহকদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্য আদায় না করা গেলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিরল সম্পদের ওপর আরও বেশি চাপ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রশাসন ও পরিচালনার ভার এখন বহুলাংশে বিধিবদ্ধ স্বাধীন নিয়ামক কমিশনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণের দিক থেকে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, অর্থাৎ হঠাৎ হঠাৎ যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বা কোনও এলাকায় সরবরাহে ঘাটতি না দেখা যায় তা সুনিশ্চিত করতে এই কমিশনগুলিকে স্বাধীনভাবে নিরীক্ষণ বা অডিট চালাতে হবে। কারণ, বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে অসহায় গ্রাহকদের যদি চড়া দাম দিয়ে অন্য শক্তিসম্পদ, যেমন ডিজেলের মতো দূষণ সৃষ্টিকারী উৎসের দিকে ঝুঁকতে হয় তবে তার চেয়ে দুভার্গ্যজনক হেঁয়ালি আর কিছু হতে পারে না।

ভারতের শক্তিক্ষেত্রের ফলাফল আশাব্যঞ্জক হলেও আত্মসন্তুষ্টির কোনও অবকাশ নেই। এ দেশের শক্তি নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি কয়লা এবং পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জলসম্পদের ওপর চাপ পড়বে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চাহিদা আরও বাড়বে। তখন হয় তো সমুদ্রের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না। আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষ করে অপরিশোধিত তেলের ওপর

**সারণি-১**
**৩১/০৫/২০১৬ তারিখের তথ্যানুযায়ী (ক্ষেত্রভিত্তিক) সর্বভারতীয় নিরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা**

| ক্ষেত্র | তাপবিদ্যুৎ | | | | পরমাণু বিদ্যুৎ | জলবিদ্যুৎ | পুনর্নবীকরণ-যোগ্য শক্তি | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কয়লা | গ্যাস | ডিজেল | মোট | | | | |
| কেন্দ্র | ৫১৩৯০.০০ | ৭৫৫৫.৩৩ | ০.০০ | ৫৮৯৪৫.৩৩ | ১১৫৭১.৪৩ | ০.০০ | ৭৬২৯৬.৭৬ | |
| রাজ্য | ৬৪১৩০.৫০ | ৭২১০.৭০ | ৩৬৩.৯৩ | ৭১৭০৫.১৩ | ০.০০ | ২৮০৯২.০০ | ১৯৬৩.৮১ | ১০১৭৬০.৯৪ |
| সরকারি | ৭০৭২২.৩৮ | ৯৭৪২.৬০ | ৫৫৪.৯৬ | ৮১০১৯.৯৪ | ০.০০ | ৩১২০.০০ | ৪০৮৮৫.৫৭ | ১২৫০২৫.৫১ |
| সর্বভারতীয় | ১৮৬২৪২.৮৮ | ২৪৫০৮.৬৩ | ৯১৮.৮৯ | ২১১৬৭০.৪০ | ৫৭৮০.০০ | ৪২৭৮৩.৪৩ | ৪২৮৪৯.৩৮ | ৩০৩০৮৩.২১ |

**সূত্র :** সিইএ, মে, ২০১৬

নির্ভরশীল। বর্তমানে আমরা প্রায় ৭৫ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করি। ২০৪০ সালের মধ্যে আমদানির এই অংকটা ৯০ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশের বাস ভারতে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের মোট প্রাথমিক শক্তির মাত্র ৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয় এ দেশে। ২০০০ সালে যা ছিল তার তুলনায় দেশে শক্তির ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ হলেও এখনও তা বিশ্বব্যাপী গড়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। এখনও দেশের প্রায় ২৪ কোটি মানুষের কাছে বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছয়নি। হিসাব করে দেখা গেছে যে দেশের ৮৪ কোটি মানুষ প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ পৌঁছেছে ৮১ শতাংশ মানুষের কাছে এবং ৩৩ শতাংশ মানুষ রান্নার জন্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করেন। এ দেশে থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণের মাত্রা বিশ্বের মোট নিঃসরণের ৬ শতাংশ এবং মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা বিশ্বজনীন গড়ের ৩০ শতাংশ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা ৫ শতাংশ। বাছাই করা দেশগুলিতে ২০০০ এবং ২০১৩ সালে টন খনিজ তেল সমতুলের (toe) হিসাবে মাথাপিছু শক্তিসম্পদের চাহিদার একটি তুলনামূলক ছবি পেশ করা হল চিত্র-১-এ।

**চিত্র-১**
**বাছাই করা দেশগুলিতে মাথাপিছু শক্তির চাহিদা**

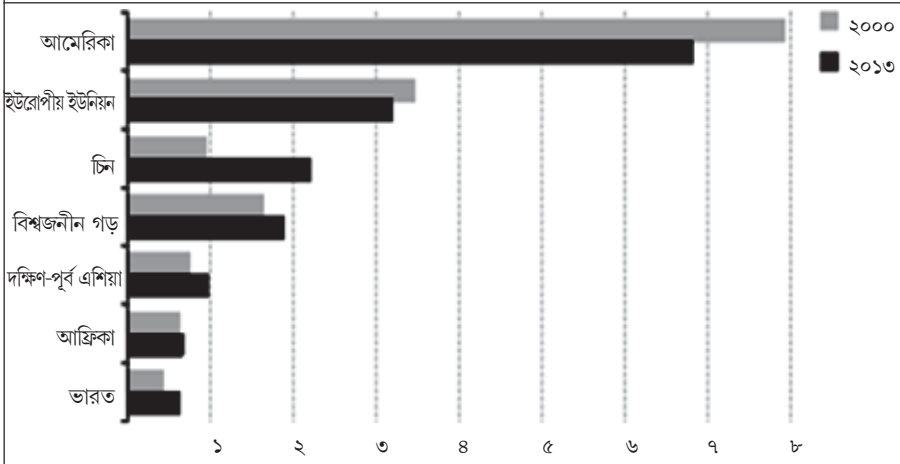


**সূত্র :** আই ই এ ইন্ডিয়া এনার্জি আউটলুক ২০১৫

**চিত্র-২**
**ভারতে প্রাথমিক শক্তির চাহিদার একটি সামগ্রিক চিত্র**

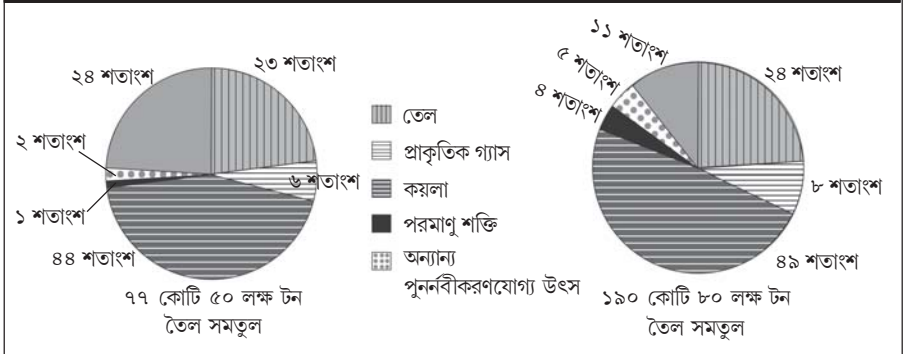


**সূত্র :** আই ই এ ইন্ডিয়া এনার্জি আউটলুক ২০১৫

২০১৩ সালে ৭৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন খনিজ তেল সমতুল (MToe) প্রাথমিক শক্তির চাহিদা ছিল ভারতে। এই চাহিদার ৪০ শতাংশ কয়লা, ২৩ শতাংশ তেল (যার ৪০ শতাংশই গেছে পরিবহণ ক্ষেত্রে), ৬ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস, ২৪ শতাংশ জৈব জ্বালানি, ১ শতাংশ পরমাণু শক্তি এবং বাকি ২ শতাংশ পূরণ করেছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা বা IEA-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৪০ সালে এ দেশে মোট শক্তিসম্পদের চাহিদা গিয়ে দাঁড়াবে ১৯০ কোটি ৮০ লক্ষ টন খনিজ তেল সমতুলে। এর ৪৯ শতাংশ কয়লা এবং ২৪ শতাংশ তেল পূরণ করবে বলে পূর্বাভাস। এছাড়া পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিগুলির অংশভাগ বেড়ে ৫ শতাংশে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জৈবভর বা বায়োমাসের অংশ ১১ শতাংশে কমে দাঁড়ানোর এক

তাৎপর্যপূর্ণ আভাস পাওয়া গেছে। পরিবহণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়লে দেশে শক্তিক্ষেত্রের উৎসগুলির অবদান আগাম হিসাবকেও ছাপিয়ে যাবে। IEA-এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের ছবি চিত্র-২-তে তুলে ধরা হল।

প্রতিটি পরিবারে শক্তি/বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়াও ভারতের শক্তিসম্পদের অধিকার বা 'এনার্জি অ্যাকসেস কর্মসূচি'র প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার তারের সরবরাহ, বেশি ভোল্টেজ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ভোল্টেজে রূপান্তরের উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরক ব্যবস্থাকে লাভজনক করে তুলতে বিতরক সংস্থাগুলির কাজকর্ম ও পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করে তোলাও প্রয়োজন। ৩১.০৫.২০১৬ তারিখের তথ্যানুযায়ী, দেশের মোট ৫,৯৭,৪৬৪-টি গ্রামের মধ্যে ৫,৮৬,৯৪৮-টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অতি দুর্গম অঞ্চলগুলিই একমাত্র বাদ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির এক্তিয়ারে থাকা বিতরণ ব্যবস্থা যদি ঠিকমতো কাজ না করে এবং কেন্দ্র, রাজ্য বা বেসরকারি ক্ষেত্রের অধীনে থাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উৎপাদক সংস্থাগুলির প্রাপ্য মূল্য যদি মেটানো না যায়, তাহলে নগদ অর্থের জোগানে বাধা আসবে। এর ফলে সামগ্রিক শক্তিক্ষেত্রের ওপর সমস্যা তো আসবেই, সেই সঙ্গে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরও চাপ পড়বে।

কারণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঢেলে থাকে। ভারতে প্রধানত কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের যে অংশভাগ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত তার মোট পরিমাণ ৩,০৩,০৮৩ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ৬১.৪ শতাংশ এই কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ। এর পরে রয়েছে গ্যাস (৮ শতাংশ) ডিজেল (০.৩ শতাংশ)। অর্থাৎ, এখানে তাপবিদ্যুতের অংশভাগ মোট ৬৯.৮ শতাংশ। এছাড়া পরমাণু শক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির অংশভাগ যথাক্রমে ২ শতাংশ, ১৪ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশ। সারণি-১-এ এই সংক্রান্তি জ্বালানি ও মালিকানা ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।

**সারণি-২**
**উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি : কাজকর্মের পর্যালোচনা**

| | অষ্টম পরিকল্পনাকাল | নবম পরিকল্পনাকাল | দশম পরিকল্পনাকাল | একাদশ পরিকল্পনাকাল | দ্বাদশ পরিকল্পনাকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় | ৭,৭১৭ | ৩,৬২৪ | ১১,০৮৫ | ১৪,৩৪০ | ১৫,১৪২ |
| রাজ্য | ৬,৮৩৫ | ৯,৪৫০ | ৬,২৪৫ | ১৬,৭৩২ | ১৯,২৯১ |
| বেসরকারি | ১,৪৩১ | ৫,০৬১ | ২,৬৭০ | ২৩,০১২ | ৪৯,৫৫৮ |
| | **১৫,৯৮৩** | **১৮,১৩৫** | **২০,০০০** | **৫৪,০৮৪** | **৮৩,৯৯১** |
| তাপবিদ্যুৎ | ১৩,৫৫৫ | ১৩,৫৯৭ | ১২,১১৪ | ৪৮,৫৪০ | ৮০,১৮০ |
| জলবিদ্যুৎ | ২,৪২৮ | ৪,৫৩৮ | ৭,৮৮৬ | ৫,৫৪৪ | ৩,৮১১ |
| **পুঞ্জীভূত (তাপবিদ্যুৎ + জলবিদ্যুৎ)** | **১৫,৯৮৩** | **১৮,১৩৫** | **২০,০০০** | **৫৪,০৮৪** | **৮৩,৯৯১** |

**সূত্র** : শক্তিমন্ত্রক

**চিত্র-৩**
**৩১/৫/২০১৬ তারিখের তথ্যানুযায়ী সর্বভারতীয় হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতা**

**(মেগাওয়াট)**

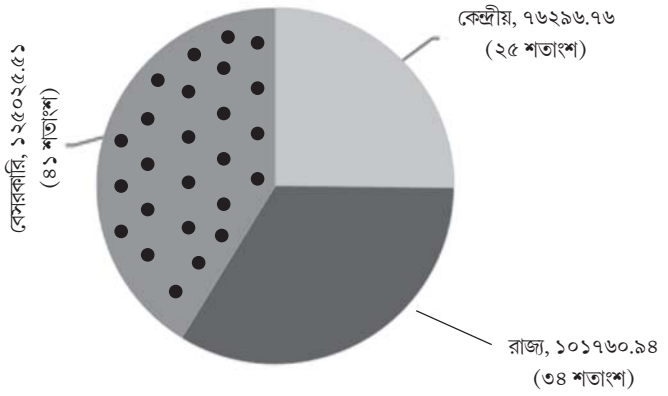


**সূত্র** : সি ই এ (মে, ২০১৬)

এক দশকের মধ্যে এক ধাপে যেভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের মালিকানা যেভাবে মোটামুটি ১০ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে পৌঁছে গেছে তা রীতিমতো সাফল্যের পরিচায়ক। দশম পরিকল্পনাকালের পাঁচ বছরে মোটামুটি ২০,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি থেকে একাদশ পরিকল্পনাকালে ৫৪,০৮৪ মেগাওয়াট (এছাড়াও নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরি বা ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি রয়েছে) উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাহিনী রীতিমতো চমকপ্রদ। দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অংকটা ১,০০,০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুতের অবদানই প্রধান। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশে গ্যাসের অভাবে গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন মার খেয়েছে। দূষণহীন এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তির অন্যতম উৎস হিসাবে পরিচিত জলবিদ্যুতের উৎপাদন কমেছে। দশম পরিকল্পনাকালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭,৮৮৬ মেগাওয়াট সেখানে একাদশ পরিকল্পনাকালে তা নেমে আসে ৫,৫৪৪ মেগাওয়াটে। দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে জলবিদ্যুতের

চিত্র-৪

**পাইচার্টে ৩১/৫/২০১৬ তারিখের তথ্যানুযায়ী জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার একটি ছবি পেশ করা হল**

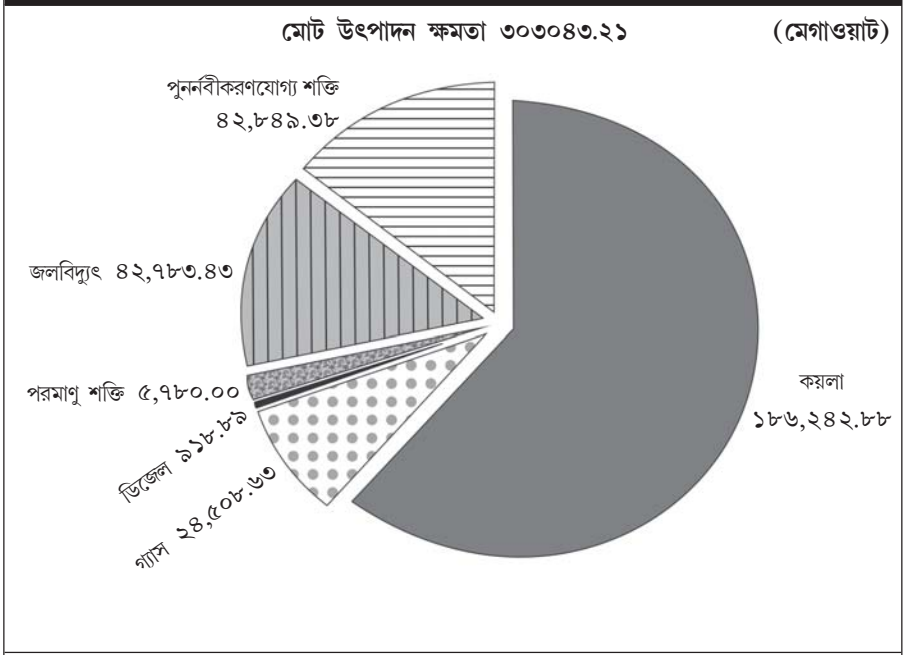


সূত্র : সি ই এ (মে, ২০১৬)

অংশভাগ ৫ শতাংশেরও নিচে নেমে যাবে বলে অনুমান। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় জলবিদ্যুতের অংশভাগ ১৪ শতাংশ। একাদশ পরিকল্পনায় সৌর ও বায়ুশক্তির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি ভীষণভাবে গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এই উৎসগুলি থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে জলবিদ্যুতের মতো ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তির অভাব থাকলে গ্রিডের বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসুবিধা হবে। সারণি-২-এ অষ্টম থেকে দশম পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।

কোনও কারণে কাজ স্থগিত না হলে যে কোনও কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পুরোদস্তুর উৎপাদন শুরু হতে ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগে। অন্যদিকে, একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি চালু হতে সময় লাগে ৮ থেকে ১০ বছর। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বিকাশের হার মোটামুটি ৮ শতাংশে ঘোরাফেরা করার যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির পথটা মসৃণ রাখতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক প্রকল্পকে পরপর তৈরি রাখতে হবে, যাতে সেগুলি প্রয়োজনে চালু করে দেওয়া যায়। যেমন, বর্তমানে মোট ৬৫,১৮৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৯,২৮৯ মেগাওয়াট। ৩০,০৭০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন কারণে স্থগিত রয়েছে। কয়লাভিত্তিক সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ভারতের দেশীয় প্রযুক্তি বিশ্বমানের। ভারত বছরে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানে এই উৎপাদন ক্ষমতার একটা বড় অংশকেই কাজে লাগানো হচ্ছে না। এই অপচয় উচিত নয়। এখন পরিবেশবান্ধব উপায়ে দক্ষতার সঙ্গে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যে কেন্দ্রগুলির বয়স পঁচিশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সেগুলি থেকে দক্ষভাবে উৎপাদন সম্ভব তো নয়ই, বরং দূষণ ছড়ানোর সম্ভাবনাও অনেক বেশি। কিন্তু উৎপাদক সংস্থাগুলি আবার এই সব কেন্দ্র বন্ধ করতে নারাজ। কারণ, শুধু জ্বালানির জন্য ব্যয় করলেই কেন্দ্রগুলি চালানো যাচ্ছে। কয়লার এই অদক্ষ ব্যবহার চলতে দেওয়া যায় না। এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অদক্ষতাজনিত কর বসানো যেতে পারে। কয়লার ব্যবহারের আনুপাতিক হারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুল্যমূল্য হবে এই করের পরিমাণ। এ বিষয়ে শক্তিমন্ত্রকের তরফে সম্প্রতি যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শক্তিমন্ত্রকের সিদ্ধান্ত, এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণে এখন থেকে আর কোনও অর্থ মঞ্জুর করা হবে না। বদলে অবিলম্বে শক্তিসম্পদ কাজে লাগানোয় সুদক্ষ সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে কঠোরভাবে $SO_x$ এবং $NO_x$ নিঃসরণের বিধি এবং অতি সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে জল ব্যবহারের শর্ত প্রয়োগ-সহ আরও বেশি দক্ষতাসম্পন্ন আলট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কেন্দ্রগুলি থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে আমাদের। আগামী দিনে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জলের জোগান দেওয়া রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সেকথা মাথায় রেখেই এই কেন্দ্রগুলিতে জলের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতার (ইনস্টলড ক্যাপাসিটি) বৃদ্ধির অংকটা ৯.৮১ শতাংশ থেকে ১১.৭০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে এবং অংকটা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়লা ও লিগনাইটভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনগুলির ওপর প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর (PLF) ২০১৩ সালে যেখানে ছিল ৬৯.৯৩ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে হয়েছে ৬২.২৮ শতাংশ। কিন্তু অন্যদিকে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির PLF-এর আরও অবনতি হয়েছে। এই ধরনের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে যন্ত্রপাতির

**চিত্র-৫**
**সরবরাহের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অবস্থা**

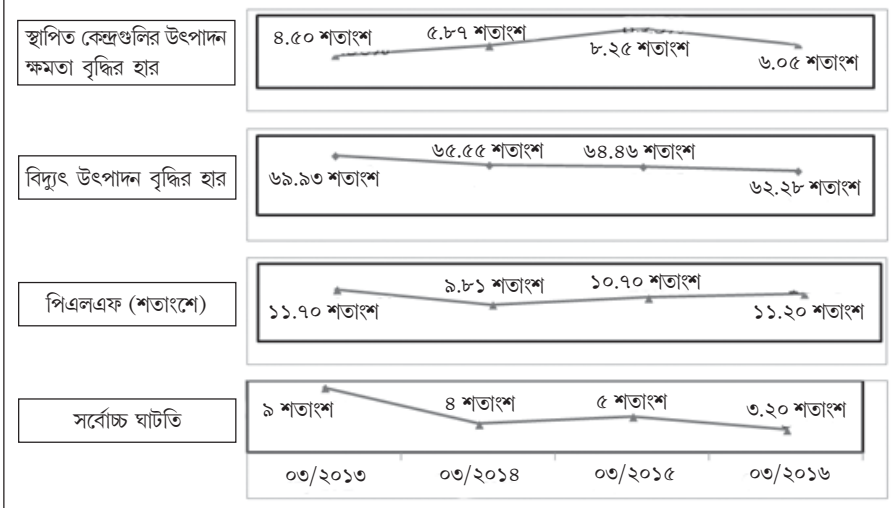


সূত্র : শক্তি মন্ত্রক

কার্যক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হলে তবেই উৎপাদন ব্যয় কমানো যাবে। চিত্র-৫-এ এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির একটা ছবি তুলে ধরা হল।

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির তরফে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে (সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি বা CEA) দেওয়া তথ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির ছবিটা স্পষ্ট। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশজুড়ে বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল ১ শতাংশ, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, ২.৩ শতাংশ। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৭.৩ শতাংশ এবং আন্দামান ও নিকোবরে ২৫ শতাংশ ঘাটতির তথ্যটা উদ্বেগজনক হলেও তাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা যেতে পারে। ওই একই সময়পর্বে দেশে চহিদার চূড়ান্ত ঘাটতির অংকটা ছিল মাত্র ২.১ শতাংশ। এর মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই ছিল সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশ। অর্থাৎ, এক দশক আগেকার দুই অংকের চাহিদার ঘাটতির জামানা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। উৎপাদন ও সরবরাহ ক্ষমতা যে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা তারই সুফল। বিদ্যুৎ বণ্টন কেন্দ্রগুলি (পাওয়ার এক্সচেঞ্জ) থেকে একক প্রতি ২ টাকার কিছু বেশি দামে গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বণ্টন সংস্থাগুলি ভুল তথ্য না দিলে এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা স্ট্যান্ড-বাই উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনও প্রয়োজনই নেই। এবার রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ামক কমিশনগুলিকে (SERs) অনলাইনে নির্ভরযোগ্য অডিট চালাতে হবে।

এ দেশের হাই ভোল্টেজ সরবরাহ ক্ষেত্রটি বিশ্বের এই ধরনের বৃহৎ ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। EHC AC এবং HVDC ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের পাঁচটি বিদ্যুৎ অঞ্চলের মধ্যে সংযোগস্থাপন করা হয়েছে। ৫৯,৫৫০ মেগাওয়াট আন্তঃআঞ্চলিক সরবরাহ ক্ষমতা-সহ দেশের মোট সরবরাহ ক্ষমতা বর্তমানে ৬,৬৬,৮৮৪ মেগাওয়াট। AC সাবস্টেশন-গুলির ট্রান্সফরমেশন ক্ষমতা ৬,৫১,৮৮৪ মেগাওয়াট। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য যে শক্তিগুলির উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন হয় না সেগুলিকে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে গ্রিডে দিয়ে দেওয়ার 'ইভ্যাকুয়েশন' প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃরাজ্য করিডোর-সহ একটি পরিবেশবান্ধব শক্তি করিডোর পরিকল্পনা রূপায়ণের স্তরে রয়েছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ার দরুন গত ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর সারা দেশে বিদ্যুতের একটি অভিন্ন মূল্য স্থির করা গেছে, যা একক প্রতি ২.৩০ টাকা। এই ঘটনা দেশের ইতিহাসে প্রথম। দুই দশকের কঠোর পরিশ্রমের পর এই সাফল্য কম নয়।

দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বিণ্টন ব্যবস্থার আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দিকগুলোকে ঢেলে সাজানো দরকার। ২০০৮-'০৯ সালে নতুন করে গঠিত ত্বরান্বিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি (APDRP)-এর আওতায় জোরদার উদ্যোগ সত্ত্বেও ২০১০-'১১ সালে বণ্টন সংস্থাগুলির পুঞ্জীভূত প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৬.৩৫ শতাংশ। CEA-এর তথ্যানুযায়ী ২০১২-'১৩ সালের সর্বশেষ সাময়িক হিসাবে এই ক্ষতির অংকটা ছিল ২২.৭০ শতাংশ। রাজ্যগুলির মালিকানাধীন ৪৮-টি বণ্টন সংস্থায় (ডিসকম—Discom) এই ক্ষতি অংকটা আরও অনেক বেশি। ২০১৩-'১৪ সালে এই ধরনের ১৪-টি সংস্থার পুঞ্জীভূত প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক ক্ষতির পরিমাণ ২৫ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে এবং ৯-টি সংস্থায় এই ক্ষতির অংকটা ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে সংস্থাগুলি ঘোর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। বেশ কয়েকটি দিক থেকে এই ধরনের সংস্থাগুলি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ভাবমূর্তিটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। সংস্থাগুলির কাজেকর্মে দক্ষতার অভাব তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে বহু রাজ্যেই বিদ্যুৎ নিয়ামক কমিশনগুলি রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের চাপে প্রয়োজনের তুলনায় কম করে মূল্য নির্ধারণ করেছে। এর ফলে ঋণ ও ক্ষতির ভারে জর্জরিত হয়েছে ডিসকমগুলি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সরকার ২০১২ সালে একটি 'ডিসকম পুনর্গঠন পরিকল্পনা' হাতে নেয়'। কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন এসে যাওয়ায় এই পরিকল্পনাটি আর সাফল্যের মুখ দেখেনি। ডিসকমগুলির পুনর্গঠনের জন্য বর্তমান সরকার ২০১৫ সালের একটি জোরদার এবং সর্বাত্মক UDAY প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ-এর হিসেব অনুযায়ী ডিসকমগুলির যে পরিমাণ ঋণের বোঝা ছিল তার ৭৫ শতাংশের দায় পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। এতে

ডিসকমগুলির ওপর থেকে সুদের বোঝা কমেছে। কিন্তু গ্রাহক পরিষেবা তথা বণ্টন ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর মিটার ব্যবস্থা চালু করা এবং বিল তৈরি ও বিনিময় মূল্য আদায়ের কাজে দক্ষতার ওপরই কিন্তু নির্ভর করছে এই প্রকল্পের প্রকৃত সাফল্য। ডিসকমগুলির প্রযুক্তিগত ও আর্থিক কুশলতা, রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা তথা SERC-গুলির সামর্থ্য ও বিচক্ষণতার ওপর এই প্রকল্পের সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। কোনও ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ বা ছাড়ের সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিক্ষেত্রে মোট ১০,৭৫,৪২১ কোটি টাকা ঢেলেছে। সারণি-৩-এ এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল।

২০১৪ সালের মার্চে ডিসকমগুলির বিক্রি হওয়া প্রতি একক বা ইউনিট বিদ্যুতে ০.৭৩ টাকা করে রাজস্ব ঘাটতি থেকে যাচ্ছিল। SEB/ডিসকমগুলির ঋণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকায়। আলাদা আলাদাভাবে SEB/ডিসকমগুলির ক্ষতির অংকটা ১,৭৬,৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সংস্থাগুলির সামনে অবস্থাটা ছিল রীতিমতো মরণ-বাঁচনের। এই পরিপ্রেক্ষিতে UDAY উদ্যোগ একটা সময়োচিত পদক্ষেপ।

রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় হলেও শক্তিমন্ত্রক মূলত বিপুল পরিমাণে ডিস্টিবিউশন ট্রান্সফর্মেশন অর্থাৎ বিদ্যুৎ বণ্টনের সময় বণ্টনের লাইন থেকে গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ভোল্টেজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছে। বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও ধোপদুরস্ত ও ত্রুটিমুক্ত করে তোলাই মন্ত্রকের লক্ষ্য। সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন (SCANDA)-এর ব্যবস্থা-সহ নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতি মেরামতে সক্ষম গ্রিড, বণ্টন পরিচালন ব্যবস্থা (DMS), জিআইএস ম্যাপিং, গ্রাহক সূচি তৈরি, চাহিদার দিকটির ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক মিটারিং ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রিড ব্যবস্থাপনা শুধু যে

**সারণি-৩**
**শক্তিক্ষেত্রে অর্থের জোগান**

| শক্তিক্ষেত্রে অর্থে জোগান | টাকার অংক (কোটিতে) |
|---|---|
| বিভিন্ন ব্যাংক | ৫,৭৯,৮৭৫ |
| পিএফসি | ২,৩৮,৯২০ |
| আরইসি | ২,০১,২৭৮ |
| আইডিএফসি (৪০ শতাংশ অগ্রিম হারে) | ১৮,২৮০ |
| এল এবং টি ইনফিরা | ১৫,৪৪৩ |
| আইআরইডিএ (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) | ৮,১২৫ |
| পিএফএস | ৮,৫০০ |
| অন্যান্য (আনুমানিক) | ৫,০০০ |
| **মোট** | **১০,৭৫,৪২১** |

**সূত্র** : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাক্‌কলিত

একটি তথ্য বিশ্লেষণমূলক প্ল্যাটফর্মের রূপ পাবে তা নয়, বরং সেই সঙ্গে অভূতপূর্বভাবে নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য সৌর ও বায়ুশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে গ্রিডে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে এবং এক নতুন শ্রেণির জন্ম দেবে, যাদের বলা হবে 'প্রোজিউমার' (প্রোডিউসার ও কনজিউমার একযোগে)। এ বছরের গত ১১ জুলাই গুরগাঁও-তে মোট ৭ হাজার কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে এ দেশের প্রথম বৃহৎ স্মার্ট গ্রিড সিটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছে সরকার। এই ধরনের প্রকল্পগুলিকে খুব দ্রুত চালু করে দিতে হয়। 'ক্লিন এনার্জি সেস' (তহবিল) বা বর্তমানের 'ক্লিন এনভায়রনমেন্ট সেস' (তহবিল) এই ধরনের প্রকল্পে অর্থ জোগানের সবচেয়ে ভালো উৎস।

প্রচুর কয়লার জোগানের ওপরই নির্ভর করছে ভারতের শক্তি নিরাপত্তা। দেশের কয়লায় ছাইয়ের অংশ প্রায় ৪০ শতাংশ হলেও সালফারের পরিমাণ কম। ওড়িশায় নতুন খনিগুলো থেকে যে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে তাতে ছাইয়ের পরিমাণ আরও বেশি। দেশে কয়লার বিপুল সঞ্চয়ভাণ্ডার থাকলেও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লার জোগানে টান পড়ছে। ফলে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা আমদানি করতে হয়েছে। গত দু' বছরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কয়লা উৎপাদন বা জোগানের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার কোল ইন্ডিয়ার (CIL)। এই সংস্থা ৫৩৮.৭৫ Mt কয়লা উৎপাদন করে এবং বিক্রির জন্য আলাদা করে রাখে ৫৩৪.৫০ Mt কয়লা। ২০১৪-'১৬ সালে এই সংস্থার উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেড়েছে। মূলত রেলেই কয়লা পরিবহণ হয়। দৈনিক রেক প্রতি ওয়াগন লোডিং অ্যাভারেজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১২.৭-এ, যা ২০১৪-'১৫ সালের তুলনায় ৯.৩ শতাংশ বেশি। এই প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কাছে ২৮ দিন কাজ চালানোর মতো কয়লা মজুত রয়েছে। এছাড়া ২০১৫ সালের মার্চের শেষে কোল ইন্ডিয়ার কাছে ৫৮ Mt কয়লা মজুত ছিল। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কাছ থেকে ক্রমেই কয়লার চাহিদা কমে আসায় স্টিম কয়লা রপ্তানির দিকে নজর দিচ্ছে কোল ইন্ডিয়া। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে এখনও অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে, যেমন পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়া, জমি হাতে পাওয়া, নতুন এলাকায় রেল যোগাযোগ, উৎপাদনশীলতা, কয়লা শোধনের সমস্যা ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিককালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র ও অনুসন্ধানের কাজে অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি আগের চেয়ে অনেকটা দূর হলেও কয়লার গুণমান ও অনুসন্ধানের জন্য ড্রিলিং-এর অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা

রয়েছে। নতুন নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। তবে কয়লা শোধনাগারগুলি এখনও তেমনভাবে চালু হয়নি। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করা প্রয়োজন। ২০১৬-'১৭ সালে ৫৯৮.৬১ Mt কয়লা উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। কয়লা ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মধ্যে বোঝাপড়া এখন অনেক বেড়েছে। এখন স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কয়লার ব্লকগুলি নিলাম করা হচ্ছে। অশুভ আঁতাঁতের মাধ্যমে কয়লা ব্লকগুলি বণ্টনের যে ধারণা আগে তৈরি হয়েছিল তা দূর করা গেছে। তবে সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে শুধু প্রতিযোগিতামূলক দর ডাকার মাধ্যমে কলয়া ব্লক বণ্টনের এই পদ্ধতির সাফল্য এখনও প্রমাণিত হয়নি। ভারতের কয়লাখনিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোলামুখ খনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেশে ১ বিলিয়ন মেট্রিকটন (Mt) কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার কথা ঘোষণা করেছেন।

২০১৫ সালের ১ এপ্রিলের তথ্যানুযায়ী এ দেশের কয়লাসম্পদের পরিমাণ ৩০৬ বিলিয়ন টন (অর্থাৎ, ৩০৬০০ কোটি টন) এবং এই কয়লা সঞ্চিত রয়েছে ভূগর্ভের ১২০০ মিটার পর্যন্ত। ৩০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় যে ৬০ শতাংশ কয়লা সঞ্চিত রয়েছে খোলামুখ খনন ব্যবস্থায় সেগুলি উত্তোলন আর্থিকভাবে লাভজনক এবং সুবিধাজনকও বটে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের চাহিদা মেটানো ছাড়াও কয়লার এই প্রাচুর্য ভারতের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। $SO_x$ $NO_x$ এবং পার্টিকুলেট ম্যাটারের নিঃসরণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী হইচই সত্ত্বেও কয়লার এই সঞ্চয় ভাণ্ডার ভারতকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে রাখবে। তেল আমদানির ওপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়লা থেকে বাণিজ্যিকভাবে তরল জ্বালানি বা কয়লা থেকে সার উৎপাদনের দিকে আমরা নজর দিতে পারি। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম এখন কমে এসেছে। এই অনুকূল পরিবেশে আমাদের অবিলম্বে কয়লা থেকে সার বা তরল জ্বালানি উৎপাদনের প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে পারি। আগেই বলা হয়েছে, যে বিপুল কয়লার ভাণ্ডার ভারতের পক্ষে একটা রীতিমতো সৌভাগ্যের কারণ। এদিকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার্বন আবদ্ধ করে তার সঞ্চয় মোটেই কোনও সমাধানের পথ নয়। কার্বন আবদ্ধ করা এবং তার সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে আমাদের। নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে বেকিং সোডা, ইউরিয়া, প্লাস্টিক, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য অনেক পণ্য তৈরির প্রযুক্তি রয়েছে এ দেশে। এই প্রযুক্তিগুলিকে কাজে লাগালে লাভজনকভাবে বায়ুমণ্ডলকে কার্বন মুক্ত করার পথটি খুলে যাবে।

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে একটি পরিবেশবান্ধব শক্তি তহবিল (ক্লিন এনার্জি ফান্ড) গড়ে তোলার জন্য খনি থেকে প্রতি টন কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা হারে সেস বা উপকর বসানো হয়েছিল। বর্তমানে সেসের হার বাড়িয়ে করা হয় টন পিছু ৪০০ টাকা এবং তহবিলটির নামকরণ হয়েছে 'পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তহবিল' (ক্লিন এনভায়রনমেন্ট ফান্ড)। কয়লার ওপরই যেহেতু এই সেস এবং এই সেসবাবদ যেহেতু কয়েক হাজার কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা, তাই এই অর্থ প্রথমেই কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার তথা কয়লা থেকে তরল জ্বালানি, গ্যাস ও সার উৎপাদনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করা উচিত।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পরিবহণ ক্ষেত্রেরও ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে, যা কিনা উন্নয়ন, মানুষের উপার্জন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ ও নগরায়ণ প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও বেড়েছে বহু। ২০১৩ সালে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা ছিল ৯০। জাপানে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৫৫০-টি ব্যক্তিগত গাড়ি, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৫২০-টি এবং চিনে ৩৫০-টি গাড়ির তুলনায় এই সংখ্যাটা নেহাতই নগণ্য হলেও ভারতের বিপুল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুপাত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। মোটরযানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে তেলের চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনই অন্যদিকে শহরগুলিতে বায়ুদূষণ ছড়াচ্ছে। বর্তমানে দিল্লিতে ৮০ লক্ষ গাড়ি রয়েছে এবং প্রতিদিন ব্যক্তিগত নতুন গাড়ির সংখ্যা ১১০০ করে বাড়ছে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ডিজেলের দাম কম থাকার দরুন ডিজেলচালিত গাড়ির সংখ্যা লাগাম ছাড়া ভাবে বেড়ে গেছে। তেল আমদানির ওপর দেশের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা মাথায় রেখে শহরাঞ্চলে পরিবহণের জন্য বিদ্যুৎচালিত গাড়ি বা বাস ব্যবহার, কিংবা ট্রাম এবং মেট্রোরেল পরিষেবা ব্যবহারের জন্য জোরদার প্রচার চালানো দরকার। এর সঙ্গে শহরের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কর্মসূচিকেও যুক্ত করা যেতে পারে। এজন্য ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎচালিত রিক্সা, দু' চাকার যান, ব্যক্তিগত গাড়ি নির্মাণের কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। পরিবেশবান্ধব শক্তি/পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তহবিল থেকেই এই কর্মসূচির জন্য অর্থের জোগান আসতে পারে। কারণ এই ধরনের কর্মসূচিতে বিদ্যুতের উৎসই হবে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ বা সৌর ফোটোভোল্টেইক বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎচালিত গাড়ি চলতে শুরু করলে দিনের বেলায় যে উদ্বৃত্ত সৌরবিদ্যুৎ থাকে তার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যাবে এবং ব্যাটারিতে সেই বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজন পড়বে না। সেই সঙ্গে শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণও কমবে অনেকখানি।

ভারতে চাহিদার তুলনায় হাইড্রোকার্বনের জোগান ক্রমশই কমছে। যেসমস্ত জায়গায় হাইড্রোকার্বন রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে সেখানকার সঞ্চয় ভাণ্ডারও অত্যন্ত সীমিত। আর গভীর সমুদ্রে যে সঞ্চয় ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। এ দেশে মোট ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ২৬-টি পাললিক অববাহিকা রয়েছে। গভীর সমুদ্রের এলাকাগুলি এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী এ দেশে চূড়ান্তভাবে উদ্ধারযোগ্য তেলসম্পদের পরিমাণ হল ৩৪৪০ কোটি ব্যারেল। এর মধ্যে ১০২০ কোটি ব্যারেল হল পুঞ্জীভূত

উৎপাদন। চূড়ান্তভাবে উদ্ধারযোগ্য সম্পদের ৭১ শতাংশও বাকি থেকে গেছে। অথচ আমাদের চাহিদার ৭৫ শতাংশই আমদানি করতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের ছবিটা বরং অপেক্ষাকৃত ভালো। ২০১৪ সালে আমাদের চূড়ান্তভাবে উদ্ধারযোগ্য সম্পদের (URR) পরিমাণ ছিল ৮৮১০ বিসিএম, যার মধ্যে ৮৫০ বিসিএম নিষ্কাশন করা হয়েছে এবং মোট উদ্ধারযোগ্য সম্পদের ৯০ শতাংশই বাকি রয়ে গেছে। ২০৪০ সালে অপরিশোধিত তেলের আমদানি বেড়ে ৯০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছবে বলে অনুমান। অর্থাৎ, ২০১৪ সালে যেখানে দৈনিক ৩৭ লক্ষ ব্যারেল আমদানি করা হ'ত, সেখানে ২০৪০ সালে আমদানি করতে হবে দিনে ৭২ লক্ষ ব্যারেল। ২০২২ সালের মধ্যে আমদানি নির্ভরতা ১০ শতাংশ কমানোর যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, বাস্তবে তা যথেষ্ট কঠিন। ভারতে অনুসারী পেট্রোপণ্যের এক মজবুত ক্ষেত্র রয়েছে। সেখানে বিশ্বমানের তৈল পরিশোধনাগার, তেল বিপণনকারী সংস্থা ও উন্নত পরিকাঠামো রয়েছে। তবে গ্যাস সরবরাহের পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য আরও অনেক বাড়াতে হবে, বিশেষত, শহরগুলিতে গ্যাস বিতরণের জন্য। শেল, টাইট গ্যাস বা কোল বেড মিথেন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ২০৪০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫০ শতাংশই আমদানি করতে হবে। তৈল পরিশোধনের ক্ষেত্রে ভারতের একটা আলাদা খ্যাতি রয়েছে। এটা এ দেশের এক অন্যতম শক্তি। তবে তেলের উৎপাদন বর্তমান স্তরে ধরে রাখাটা রীতিমতো শ্রমসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেকখানি পড়ে যাওয়ায় ভারতের বিদেশি মুদ্রার ব্যয় যেমন কমেছে, তেমন তেলের ব্যবহারও রাতারাতি বেড়ে গেছে। ডিজেল ও কেরোসিনের খুচরো মূল্যে যে সংশোধন এসেছে তা বজায় রাখার জন্য জোরদার উদ্যোগ প্রয়োজন।

গ্রামের মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে নতুন 'উজ্জ্বালা' (UJWALA) প্রকল্প চালু করেছে সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলিতে রান্নার জন্য পরিবেশবান্ধব এলপিজি জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আগে কেরোসিন ভরতুকি প্রকল্পে অনেক ক্ষতি হয়েছে, এবার এলপিজি ভরতুকি প্রকল্প যাতে তেল বিপণন সংস্থাগুলির আর্থিক বোঝা না বাড়িয়ে তোলে তা সুনিশ্চিত করা দরকার। পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাসের পরিবহণই সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী।

এবার বিদেশের তৈলক্ষেত্রগুলিকে অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবেশকে নির্মল রাখার প্রতিশ্রুতির কথা মাথায় রেখে ভারত স্টেজ V-এর পরিবর্তে ২০২০ সালের মধ্যে সরাসরি ভারত স্টেজ VI-এর বিধিসমূহ প্রয়োগের কথা ঘোষণা করেছে সরকার। ফলে জ্বালানির মানোন্নয়নের জন্য পরিশোধনাগারগুলিকে বিপুল ব্যয় করতে হবে। তখন যানবাহনের ইঞ্জিন আধুনিকীকরণ বা রেট্রোফিটিং-এর প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব শক্তি/পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তহবিল থেকে অর্থের জোগান না এলে মুশকিল। না হলে পুরো আর্থিক বোঝাই উপভোক্তাদের ওপর চাপবে।

পারিসে অনুষ্ঠিত একুশতম কনফারেন্স অফ পার্টিজ (COP)-এ ভারত এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে শক্তি উৎপাদনে কার্বনের ব্যবহার ২০০৫ সালের তুলনায় ৩৩ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য পরমাণু ও নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির মাত্রাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখতে গেলে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে দেশীয় কর্মসূচি জারি রাখার পাশাপাশি বিদেশি সংস্থাগুলিকেও ডেকে আনতে হবে। উৎপাদিত বিদ্যুতের দামের ওপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে। ভারতীয় বাজারে বিদ্যুতের দাম খুব বেশি হওয়া চলবে না। এখানে ইউনিটপিছু বিদ্যুতের দাম ৪.৫০ বা ৫ টাকার বেশি হলে তা বিক্রি করা বেশ মুশকিল। কালপক্কমে ৫০০ Mwe উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটোটাইপ ফাস্টব্রিডার রিয়্যাক্টরটিকে খুব শীঘ্রই চালু করতে হবে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি থোরিয়াম জ্বালানিভিত্তিক অ্যাডভান্সড হেভি ওয়াটার রিয়্যাক্টরটিও কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত। পরমাণু শক্তিক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'কম শক্তির পরমাণু বিক্রিয়া' বা লো এনার্জি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। কোল্ড ফিউশন প্রযুক্তির জনপ্রিয়তার চাপে এই প্রযুক্তিটি এক সময় ঠাণ্ডা ঘরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রযুক্তিটি আবার নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে। এবার শুধু এর কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হবে।

নতুন পুনর্নবীকরণ শক্তির উৎসগুলি এখন যথাযথভাবেই বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। সৌর ফোটোভোল্টেইকের মূল্য যেভাবে কমেছে তাতে উৎসাহিত হয়ে ২০২২ সাল পর্যন্ত নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির মাধ্যমে ১৭৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে ভারত, যার মধ্যে থাকবে :

- ১০০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি;
- ৬০ গিগাওয়াট বায়ুশক্তি;
- ১০ গিগাওয়াট জৈবভর/কোজেন
- ৫ গিগাওয়াট ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ।

জমির জোগান রয়েছে এবং প্রতিযোগিতা-মূলক দরপত্রের মাধ্যমে ইউনিটপিছু ৫ টাকা করে মূল্য ধার্য করা হয়েছে, এমন প্রকল্পগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সমস্ত SERC ডিসকমগুলির উপর পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্রয় করার শর্ত আরোপ (রিনিউয়েবল পারচেজ অবলিগেশন) করেছে। ২০১৭-'১৮ এবং ২০১৮-'১৯ সালে সৌরশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১৫ গিগাওয়াট, ১৬ গিগাওয়াট বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক। ২০১৯-'২০ সালের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা হল ১৭ গিগাওয়াট। ২০২০-'২১ এবং ২০২১-'২২ সালের জন্য ১৭.৫ গিগাওয়াট করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

২০১৫-'১৬ সালে অতিরিক্ত ৩০১৯ মেগাওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদিত হয়েছিল। এর ফলে দেশের মোট সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল ৬,৭৬৩ মেগাওয়াট।

২০০৬-'০৭ সালে সৌরশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে ১০,৫০০ মেগাওয়াট। অগ্রগতির এই ছবিটা যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক। কারণ, ভারতে সূর্যরশ্মির কোনও অভাব নেই এবং সৌরশক্তি উৎপাদিত জ্বালানির মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব মুক্ত। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে, নিরবচ্ছিন্নভাবে এই শক্তির উৎপাদন সম্ভব নয়। এছাড়া, শক্তির চিরাচরিত উৎসগুলির ক্ষেত্রেও প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর যেখানে ৭০-৮০ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে সৌরশক্তির ক্ষেত্রে প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর মোটামুটি ২০ শতাংশ। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে উন্নত কর্মক্ষমতার নিশ্চয়তা-সহ দেশীয় প্রযুক্তিতে ফোটোভোল্টেইক সরঞ্জাম উৎপাদনে নজর দিতে হবে।

পরিবেশবান্ধব শক্তি করিডোরগুলিকে (গ্রিন এনার্জি করিডোর) আরও পাকাপোক্ত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে নজর দিতে অগভীর জলের পাম্পগুলির ওপর। CERC-এর তরফে সৌর ফোটোভোল্টেইকের ক্ষেত্রে মেগাওয়াটপিছু ৫ কোটি অর্থ সংস্থানের হিসেব দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব ধরে এই ক্ষেত্রে মোট অর্থের প্রয়োজন গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৪,৫০,০০০ কোটি টাকায়। গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্মার্ট গ্রিডগুলিই সবচেয়ে উপযোগী। অন্তত মিটার ব্যবস্থার উন্নত পরিকাঠামোয় স্মার্ট মিটার চালু করা যাবে। জমির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে। সোলার ট্র্যাকিং যন্ত্র-সহ বহু স্তরীয় সৌর প্যানেল এক্ষেত্রে কাজে দেবে। বায়ুশক্তি প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য অন্তত পক্ষে এককপিছু ৫ টাকা করে মূল্য ধার্য করতে হবে। দেশে, বিশেষ করে উপদ্বীপ এলাকায় সৌর ও বায়ুশক্তির এক মিশ্রিত ব্যবস্থাপনা সফল হতে পারে।

শক্তিক্ষেত্রে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল উৎপাদন কুশলতা এবং চাহিদার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশে রয়েছে ন্যাশনাল মিশন ফর এনহ্যান্সড্ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (NMEEE); যা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে রচিত। এর চারটি ভাগ রয়েছে।

- পারফর্ম অ্যাচিভ ট্রেড স্কিম (PAT);
- মার্কেট ট্রান্সফর্মেশন ফর এনার্জি এফিসিয়েন্সি (MTEE);
- এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফিনান্সিং প্ল্যাটফর্ম (EEEP);
- ফ্রেমওয়ার্ক ফর এনার্জি এফিসিয়েন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (FEED)।

PAT-এর প্রথম চক্রের মেয়াদ ছিল ২০১২-'১৫ সাল পর্যন্ত এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল খুব বেশি পরিমাণে শক্তি ব্যবহারকারী ৮-টি ক্ষেত্রকে। ২০১৬-'১৭ থেকে ২০১৮-'১৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদব্যাপী PAT-II চক্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পরিশোধনাগার, রেল ও ডিসকমগুলিকে। এই পর্যায়ে সঞ্চয়ের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮.৮৬৯ MToe। CFL ব্যবহারের লক্ষ্যে শুরু হওয়া 'বাচত ল্যাম্প যোজনা' থেকে উৎসাহ নিয়ে LED কর্মসূচি আজ ভীষণভাবে সফল। প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২১তম কনফারেন্স অফ পার্টিজ-এ ভারতের ঘোষিত INDC-এর লক্ষ্যগুলি পূরণের একটি পথনির্দেশিকা গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্পকেও এগিয়ে আসতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নেট জিরো এনার্জি বিল্ডিংগুলিতে ঘরে ঘরে শক্তিসম্পদ ব্যবহারের কুশলতা নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতের শক্তিসম্পদের পরিমাণের বিচারে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের শক্তিক্ষেত্রের ফলাফল যথেষ্ট ভালো। এই ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজন হয় প্রচুর এবং এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগও খুব বেশি। এই ক্ষেত্রটিকে সঠিক পথে চালিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিচক্ষণতার প্রয়োজন। শক্তিমন্ত্রক, কয়লামন্ত্রক এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রকের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে গত দু' বছরে এই মন্ত্রকগুলির কাজকর্মের মধ্যে অনেকটাই সমন্বয় সাধন করা গেছে। এবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২১তম কনফারেন্স অফ পার্টিজ-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণের জন্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে কিছু প্রগতিশীল নীতি প্রণয়ন করা জরুরি। এক্ষেত্রে শক্তি-নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি শক্তি নিরাপত্তা মজবুত করা, সকলের জন্য ২৪ ঘণ্টা গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, পরিবেশবান্ধব ও আরও দক্ষ উপায়ে ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটানোর মতো পদক্ষেপের প্রয়োজন। তবে এটি একটি মূলধন নিবিড় ক্ষেত্র হওয়ার দরুণ ২০৪০ সাল পর্যন্ত ভারতে ২.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। ক্ষণিকের রাজনৈতিক লাভালাভের হিসেবকে দূরে সরিয়ে এই বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়াটাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পরিবেশবান্ধব শক্তি/পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তহবিলের আদলে সেস বসিয়ে তেলের ওপরও একটা বড় অংকের সংগ্রহ ও জমা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রকে এখন আরও পরিবেশবান্ধব ও দূষণহীন করে তুলতে সেস বাবদ সংগৃহীত ওই অর্থ কাজে লাগানো উচিত, যাতে উপভোক্তাদের ওপর খুব একটা চাপ না পড়ে।

শক্তিক্ষেত্রে একটা বিরাট পালাবদল আসছে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত শক্তি যাতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটাও দেখা জরুরি যে, এই শক্তির ব্যবহার যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে এবং এর উৎপাদন যেন বাণিজ্যিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি হয়। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত শক্তিসম্পদ পাওয়ার অধিকার তো থাকবেই, কিন্তু আগামী দিনে সকলে যাতে নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারটুকু পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে সবার আগে।❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক শক্তিমন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব। বর্তমানে ইন্ডিয়া এনার্জি ফোরামের প্রেসিডেন্ট, এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান-সহ বহু সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। ইমেল : anilrazdan127@gmail.com)

# স্থায়ী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ভারতের শক্তিক্ষেত্র

*দিন বদলের ক্ষণে পালটে যাচ্ছে শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা। একথা বিশেষ করে খাটে ভারতের প্রসঙ্গে। শক্তির জোগান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সব দেশবাসীর জন্য শক্তির নাগাল পাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। শক্তির জোগানের উৎস বৈচিত্রপূর্ণ করাও এই নিরাপত্তার আওতাভুক্ত। সেইসঙ্গে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানোর ব্যাপারেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। সৌজন্যে প্যারিস চুক্তি। ভারতে শক্তি উন্নয়নের ইতিবৃত্তে নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস ও শক্তির দক্ষতা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একা কুম্ভ কেউ নেই। নিবন্ধকারের বক্তব্য, ভারতের বিশাল বাজার ও দেশের বিকাশকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে না দেখে বরং এক সুযোগ বলে ভাবা দরকার। ভারতের বাজারের পক্ষে সবচেয়ে মানানসই, পরিচ্ছন্ন ও কার্যকর শক্তিতে উত্তরণের জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে জোর দিয়ে এ লেখায় নজির হিসেবে এল ই ডি বাতির উল্লেখ করা হয়েছে। লিখেছেন—***ড. ঋতু মাথুর***

শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা গত কয়েক বছর যাবৎ বদলে গেছে, বিশেষত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে। গত শতকের সত্তর দশকের গোড়ায়, শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশি মাথাব্যথা ছিল শক্তির ঘাটতি ও তজ্জনিত চড়া শক্তি মাসুলের কুফল থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখা। দ্বাদশ যোজনায় বলা হয়, স্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে সাহায্য করতে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন জোগান সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে শক্তি নিরাপত্তার প্রকৃত অর্থ। আজকাল এই সংজ্ঞা আরও বিস্তারিত রূপ নিয়েছে। সমাজের সবার জন্য শক্তির নাগাল পাওয়া সুনিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক ঝুঁকি থেকে রেহাই দেবার জন্য শক্তির জোগানের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসের ব্যবহার সব দিকও তার অন্তর্ভুক্ত।

স্বাধীন হবার প্রায় ৭০ বছর পরেও ভারতের ২৩.৬ শতাংশ মানুষ আজও বেঁচে আছে মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ১.২৫ ডলারে ক্রয়ক্ষমতার সমতার (PPP) ভিত্তিতে এই অঙ্কটি হচ্ছে চরম পরিধি রেখার নির্দেশক। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন ভারতে। অথচ এদেশে জ্বালানি ব্যবহার হয় বিশ্বের মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ২০০০ সাল থেকে অবশ্য মাথাপিছু জ্বালানির চাহিদা কিছুটা বেড়েছে। তাসত্ত্বেও, বিশ্বের গড়পড়তার তুলনায় তা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এমনকি আফ্রিকার থেকেও একটু কম। দেশের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত কোটি পরিবারে এখনও গ্রিড-এর বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। গ্রামাঞ্চলে ৮০ শতাংশ পরিবার রাঁধাবাড়ার জন্য মূলত ব্যবহার করে কাঠকুটো, শুকনো লতাপাতা ও ঘুঁটে।

এহেন পরিস্থিতিতে, ভারতে শক্তি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ তাই খুবই দুরূহ। একদিকে, বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও দেশবাসীর জন্য আরও বেশি পরিমাণ উন্নত মানের শক্তি, পরিকাঠামো ও পরিষেবা জোগানোর চাপ সামলাতে হবে। সেইসঙ্গে, খেয়াল রাখতে হচ্ছে পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার দিকেও। উন্নত জগৎ এক্ষেত্রে উন্নতিশীল দেশগুলির উপর কড়াকড়ির বেড়ি পরাতে অতি তৎপর। পরিবেশ দূষণের তোয়াক্কা না করে তারা আগেই নিজেদের উন্নতি হাসিল করে নিয়েছে। আর এখন তারা সেই দূষণের দায়ভাগ নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপাতে ব্যস্ত। এছাড়া, দ্রুত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয় বিকল্প বেছে নেওয়াটাও সহজসাধ্য নয়। জমি, জল এবং অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের টানাটানি এর জন্য দায়ি। মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী বায়ুদূষণের কুফল নিয়ে চর্চা এখন আর বিশেষজ্ঞদের আলোচনাচক্রের চৌহাদ্দিতে আটকে নেই। আমজনতার চায়ের পেয়ালাতেও উঠেছে তর্কাতর্কির তুফান। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সম্ভাবনা ক্রমশ আরও বেশি ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চরম ঘটনার আশঙ্কা তাই আরও বেশি। জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা এদেশে বিস্তর। চরম জলবায়ু সামলানোর ক্ষমতা তাদের নেই বললেই চলে। জলবায়ু রদবদলের প্রভাবের মুখে ভারত এজন্য বেশ অসহায়। সঙ্কট মোচনে তাই এদেশকে বেশ তৎপর থাকা আবশ্যক। ২০১৫-র ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তিতে সব দেশ বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে আটকে রাখার লক্ষ্যে তাদের অভীষ্ট জাতীয় অবদান (ইনটেন্ডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ডেড কনট্রিবিউশন—আই এন ডি সি)-এর কথা জানিয়ে দিয়েছে। এই তালিকা খতিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখার পক্ষে অপ্রতুল।

গরিবি দূর ও সকলের জন্য বিকাশ আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। মানুষের কল্যাণখাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও ফি দশক মাথাপিছু আয় দু'গুণ করার জন্য সরকারের লক্ষ্য উচ্চ বিকাশ হার বজায় রাখা। অর্থনীতির প্রসার ঘটছে, বাড়ছে আয়, শক্তি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ মেলার ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে, অর্থনীতিতে কলকারখানার

অংশভাগ বাড়ছে এবং শহরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবের সুবাদে আগামী কয়েক দশক বৃহৎ জনসংখ্যার এই দেশে বিকাশের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে। অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শক্তি ক্ষেত্র বেজায় রূপান্তরের মুখে। ভারত ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় বিশ্বে তৃতীয়। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কলকারখানার অংশভাগ বৃদ্ধি ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ-এর যুগলবন্দির সৌজন্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি আরও বেশি হবার সম্ভাবনা। ১নং চিত্র থেকে দেখা যায়, শক্তি ও মানব উন্নয়ন সূচকের মধ্যে এক জোরাল ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু শক্তি ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত স্তরে বেঁধে রাখার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার এক চ্যালেঞ্জ। দেখতে হবে, এর আগে কিছু উন্নত দেশের এক্ষেত্রে নেওয়া ভুলপথে যেন আমরা পা না বাড়াই।

শক্তির চাহিদার দুই মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ২০০১ ও ২০১১-এর মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১২০ কোটি। এবং বছরে গড় অর্থনৈতিক বিকাশ ৮ শতাংশ। মোট প্রাথমিক শক্তি চাহিদা বেড়েছে বছরে ৫ শতাংশ হারে। ২০১১ সালে মোট প্রাথমিক শক্তি চাহিদার ৭০ শতাংশ মিটেছে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। জোগানের প্রধান উৎস ছিল কয়লা ও পেট্রল। কয়লা জুগিয়েছে ৩৯ শতাংশ এবং পেট্রল ২৩ শতাংশ। প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশভাগ ৮ শতাংশ। শক্তি ব্যবহার সবচেয়ে বেশি শিল্পক্ষেত্রে। এরপর আছে ঘরগেরস্থালি ও বাণিজ্য। তারপর পরিবহণ ক্ষেত্র। ২০১২-তে ভারতের শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন তেলের সমতুল।

## ২০৩০ ইস্তক ভারতের শক্তিচিত্র

২০৩০-এর জন্য আই এন ডি সি টার্গেট ঠিক করা দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারত ২০০৫-এর স্তরের চেয়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ নিঃশর্তে কমানোর পরিকল্পনা জমা দিয়েছে তার আই এন ডি সি-তে। এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ক্রমপুঞ্জিত কার্বন নির্গমন কমাবে ৩ গিগাবাইট। এছাড়া, শর্তসাপেক্ষে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চিত্র-১
মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ও মানব উন্নয়ন সূচক

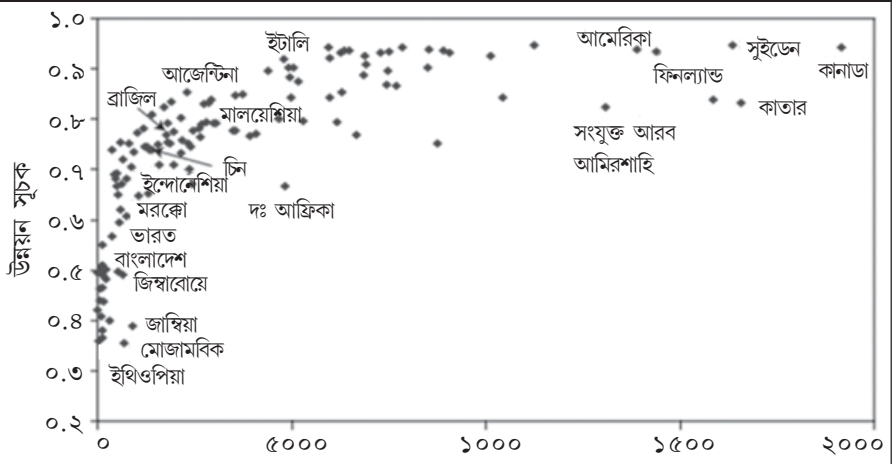


মনে রাখা দরকার যে নিঃসরণের তীব্রতা হ্রাসের জন্য ভারতের আই এন ডি সি টার্গেট সার্বিক গ্রিনহাউস গ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। মোট গ্রিনহাউস গ্যাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের অংশভাগ বেশি। এবং কার্বন নির্গমনে সবচেয়ে বেশি দায়ি শক্তি ক্ষেত্র। ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ নিঃসরণ কমানোর জন্য ২০৩০ নাগাদ কার্বন হ্রাস করতে হবে ৫ গিগাটনের মতো।

এটা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে ভারত ৮.৩ শতাংশ অর্থনৈতিক উচ্চ বিকাশ হার অর্জন করছে এবং তা বজায় রাখবে এটা ধরে নিয়ে ভারতের নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। যদিও, নিঃসরণ কমানোর প্রয়োজনীয় অনুপাতে পৌঁছানোর জন্য নিছক উচ্চ অর্থনৈতিক বিকাশ হারকে গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখাটা উচিত নয়। বরং অর্থনীতিতে লগ্নি বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে মোট মূলধন গঠন বৃদ্ধির ক্ষমতা হিসেবে উচ্চ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বিকাশ হার বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

উচ্চ মূল্য সংযুক্তির উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে কিংবা/এবং যা বাড়তি বিনিয়োগ তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এমন লগ্নির মাধ্যমে ভারত তার অভীষ্ট নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে এগোতে পারবে। অন্যদিকে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেকটা কম হলে আই এন ডি সি টার্গেটে পৌঁছনো যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ উন্নত, দক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিতে লগ্নি সেক্ষেত্রে কম হওয়ার একটা ঝোঁক থাকে। এক্ষেত্রে আগে থেকে পরিকল্পনা উপযুক্ত লগ্নির পরিবেশ গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সেজন্য অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কাঠামো ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

ভারতে আগামী কয়েক দশকের শক্তির রূপরেখা নিয়ে বেশ কিছু গবেষক গোষ্ঠী সমীক্ষা চালিয়েছে। এসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথমত, দেশে উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে শক্তির প্রয়োজন বাড়বে এবং তার ফলে নিঃসরণও অনিবার্য।

দ্বিতীয়ত, এমনকি ২০৩০ সাল নাগাদও দেশে মোট প্রাথমিক শক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানির মোটা হিস্যা থাকবে। সংরক্ষণ বা সঞ্চয় প্রযুক্তি পরিণত বা অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী না হয়ে ওঠা অবধি নবীকরণযোগ্য শক্তির খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা সত্ত্বেও চিরাচরিত জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুতের রমরমা চলবে। তৃতীয়ত, ভারতে শক্তির উত্তরণের ইতিবৃত্তে নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস ও শক্তির দক্ষতা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ম কোনও মুশকিল আসান নেই।

২নং রেখাচিত্রে নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে চললে ২০৩০ সাল তক ভারতে আই এন ডি সি-র রূপরেখা কেমন দাঁড়াবে তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র-২

প্রাথমিক শক্তি জোগান, আইএনডিসি-নিম্ন ও আইএনডিসি-উচ্চ প্রেক্ষাপটে

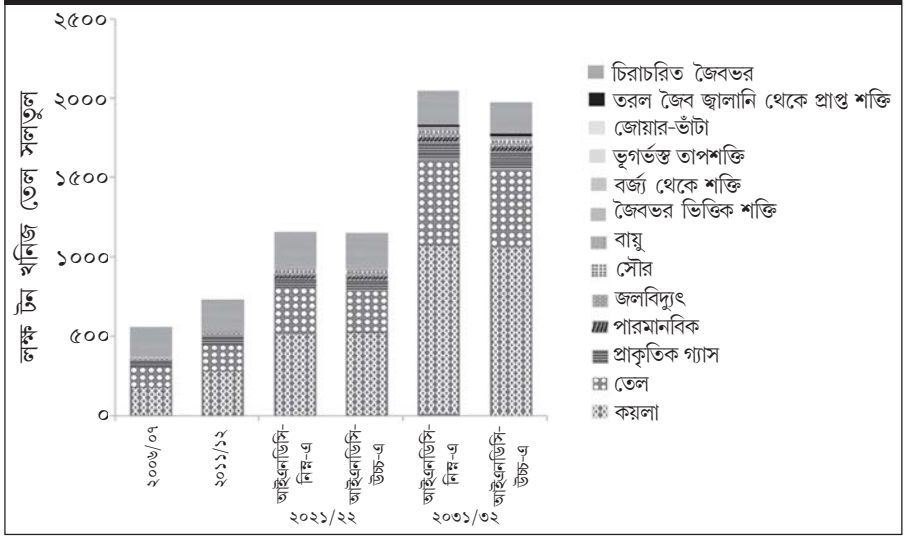


আই এন ডি সি-এল, অর্থাৎ নিঃসরণ কম হ্রাস এবং নিঃসরণ বেশি হ্রাস (আই এন ডি সি এইচ)-এর ক্ষেত্রে শক্তির সম্ভাব্য রূপরেখা আঁকতে দ্য এনার্জি রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট (টেরি)-এর MARKAL মডেল ব্যবহার করে আমরা দেখি যে ২০৩১ সালেও ভারত জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক শক্তির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল থাকবে।

নিঃসরণ কম হ্রাসের ক্ষেত্রে মোট প্রাথমিক শক্তি ব্যবহার ২০০৬-এর ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ টন তেলের সমতুল্য থেকে বেড়ে ২০৩১ সালে দাঁড়াবে ২০৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন। প্রধান জ্বালানি হিসেবে কয়লা তার স্থান বজায় রাখবে। কয়লার অংশভাগ ২০০৬-এর ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০৩১-এ পৌঁছবে ৫৩ শতাংশে। বাড়বে তেলের অংশভাগও। ২০০৬-এর ২৪ শতাংশের তুলনায় ২০৩১-এ হবে ২৬ শতাংশ। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার ২০০১-এর ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন তেলের সমতুল্য থেকে বেড়ে ২০৩১-এ ১১ কোটি টন তেলের সমতুল হলেও শতাংশের হিসেবে মোটামুটি ছয়ই থাকবে। নিঃসরণ কম হ্রাসের ক্ষেত্রে তাই ২০৩১ সালে প্রাথমিক শক্তির ৮৪ শতাংশ আসবে কয়লা, তেল ও গ্যাস থেকে। চিরাচরিত জৈবভর জোগান দেবে ১০ শতাংশ। পরমাণু বিদ্যুৎ ১ শতাংশ এবং নবীকরণযোগ্য ও বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ৫ শতাংশ চাহিদা মেটাবে।

নিঃসরণ বেশি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শক্তির আরও ৪ শতাংশ কমানো দরকার। মূলত কয়লা ও তেলের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে এটা করা হবে। কয়লা ও তেলের বদলে বাড়বে পরিচ্ছন্ন অ-জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। ২০৩১ সালে নির্গমন কম হ্রাসের ক্ষেত্রে মোট শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৩৯৮৯ টেরাওয়াট ঘন্টা। আর নিঃসরণ বেশি হ্রাসের ক্ষেত্রে উৎপাদন দাঁড়াবে ৩৯২৭ টেরাওয়াট ঘন্টা।

নির্গমন কম হ্রাসের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৬ সালের ১৩৮ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২০৩১-এ ৮৪৩ গিগাওয়াট করা দরকার। এবং নিঃসরণ বেশি কমানোর ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা হওয়া উচিত ৮২৯ গিগাওয়াট। অর্থাৎ, ২৫ বছরে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে ৬ গুণ। এমনকি, ২০৩১-এ কয়লাভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৬ সালের ৫২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৫৭ শতাংশ। ডিজেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ধীরে ধীরে উঠে যাবে। অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নবীকরণযোগ্য উৎসের অংশভাগ ২০০৬-এর ৬ শতাংশ থেকে ২০৩১ সালে ৩০ শতাংশ করা দরকার।

২০৩০ অবধি ভারতের শক্তি ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি রূপান্তরের দরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে। আজকের যৎসামান্য উৎপাদন ক্ষমতার স্তর থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ নবীকরণযোগ্য উৎসকে এক বড়সড় হিস্যাদার হবার জন্য ভবিষ্যৎ শক্তি চাহিদার ধরন বোঝা, চাহিদা-জোগানে ভারসাম্য আনতে পরিকল্পনা ও নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সঞ্চয় ও সংরক্ষণের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া জরুরি।

নিঃসরণ কমানোর পথে রূপান্তরের জন্য সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপকভাবে শক্তির দক্ষতা আনা প্রয়োজন—এজন্য চাই কার্যকর সাজসরঞ্জাম, গ্রিন বিল্ডিং (বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ভবন) শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে ফলপ্রদ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও প্রবর্তন। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদিত বিদ্যুতের চাহিদা সৃষ্টি করতে অর্থনীতিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত লগ্নির ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে ইদানীংকার পরিস্থিতি থেকে এব্যাপারে উদ্বেগ আসা স্বাভাবিক। এখন এদেশে তাপবিদ্যুৎ কারখানার প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর মাত্র ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৬০ শতাংশের সদ্ব্যবহার হয় এবং গত কয়েক বছর যাবৎ এটা চলে আসছে।

## ভারতের জ্বালানি ও প্রযুক্তি বাছাই বা পছন্দ

আগামী কয়েক দশকে ভারত যেসব শক্তি বেছে নেবে তা বেশ কিছু প্রেক্ষিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তি পরিকাঠামোয় লগ্নি করলে তার ফল হাতে পেতে সময় লাগে বছর তিরিশেক। এর প্রভাব পড়বে গ্রিনহাউস গ্যাস ও অন্যান্য স্থানীয় বায়ুদূষক নিঃসরণের উপর। ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তির ক্ষেত্রে কোনও একটি মাত্র জ্বালানি বা প্রযুক্তির পক্ষে হাল বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ মেয়াদে সমাধানের পথ হিসেবে বেশ কিছু উপায় বেছে নিতে হবে। তবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে রূপান্তর হাসিল করার জন্য মনোযোগ দিয়ে পরিকল্পনা করা দরকার। মাথায় রাখা দরকার যে অধিকাংশ শক্তি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বহু সময় লাগে এবং তার সুফল মিলতে কেটে যায় নিদেন পক্ষে বিশ-তিরিশ বছর।

এখনও অবধি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়সাশ্রয়ী বলে ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে তা সবচেয়ে কার্যকর পছন্দ। তবে দীর্ঘ মেয়াদে কম কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে এগোনোর জন্য, গভীর খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ও কয়লা

ধৌতাগারে (ওয়াশারি) লগ্নির ফল মিলতে বহু বছর লাগার দরুন বা সেরা পছন্দ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, আপাতত কয়লা আমদানি করাই হয়তো ভালো। এছাড়া, বহু জায়গা এখন জলের আকালে ভুগছে। গত কয়েক বছর এর দরুন কিছু জলবিদ্যুৎ কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এমনকি কারখানার ঝাঁপ কিছুদিন বন্ধ রাখার নজিরও আছে বৈকি! তাই তাপবিদ্যুৎ কারখানায় জলভিত্তিক শীতলীকরণের (কুলিং) পরিবর্তে প্রযুক্তি বদলে বায়ুভিত্তিক শীতলীকরণ ব্যবস্থা (এয়ার কুলড সিস্টেম) করাই ভালো।

ভারতের বিশাল বাজার এবং দেশের বিকাশকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে না দেখে বরং এক সুযোগ হিসেবে দেখা দরকার। ভারতের বাজারের পক্ষে সবচেয়ে মানানসই, পরিচ্ছন্ন ও কার্যকর প্রযুক্তিতে উত্তরণের জন্য নতুন প্রযুক্তি, নতুন বাণিজ্য মডেলের উদ্ভাবনা ও উন্নয়নে এক বড় ভূমিকা পালন করা চাই। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে এল ই ডি বাতির কথা উল্লেখ করা যায়। বিদ্যুৎ মন্ত্রকের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির এক যৌথ উদ্যোগ এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিঃ (ই ই এস এল) বিপুল খরিদের মাধ্যমে এল ই ডি বাতির দাম নামিয়ে আনতে পেরেছে। বদলানো গেছে ১০ কোটি সাধারণ বাল্ব। এপর্যন্ত ২.৫০ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন ঠেকানো গেছে।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভারতের বাড়তি সুবিধে আছে। বিশ্বের অন্যত্র পরীক্ষিত এবং ইতোমধ্যে যথেষ্ট পরিণত প্রযুক্তির সুযোগ ভারতের কাছে আছে। এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কোনও দোলাচলে ভুগতে হবে না। ব্যুরো অব এনার্জি এফিসিয়েন্সি অত্যধিক শক্তিব্যয়ী অধিকাংশ শিল্প সংস্থাকে পাঁচ বছরের মধ্যে শক্তি ব্যবহার কমানোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ। এর ফলে বাতাসে ৩ কোটি টন কার্বন ছড়ানো আটকানো গেছে। এধরনের উদ্যোগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও নেওয়া দরকার।

নবীকরণযোগ্য ক্ষেত্রে এখন বাজারে অঢেল প্রযুক্তি মেলে। কিন্তু খরচ, রূপায়ণ, সম্পদ মেলা ও আয়তনের দিকগুলির উপর এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নির্ভর করে। সরকারের লক্ষ্য খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ২০২২ সাল নাগাদ ১৭৫ গিগাওয়াট সৌর, বায়ু ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নবীকরণযোগ্য প্রযুক্তির খরচপাতি কমছে খুব দ্রুত। এবং বিশেষত ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে নবীকরণযোগ্যে লগ্নি করাটা অনেক ব্যবহারকারীর কাছে ইতোমধ্যে ব্যবসায়িক কারণে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। নবীকরণযোগ্য উৎসকে গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রযুক্তিও গ্রহণ করা দরকার। সেইসঙ্গে নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চয় বা সংরক্ষণের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ করতে হবে।

দেশের ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানির ব্যবস্থা করার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। রাঁধাবাড়ার কাজে এল পি জি-র চল বাড়ছে। ২০০১ সালে সাকুল্যে ১৮ শতাংশ বাড়িতে এল পি জি ব্যবহার হ'ত। ২০১১-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য এল পি জি-র প্রচলন এখনও নিতান্ত মামুলি। এল পি জি সংযোগ (কানেকশন) ও সিলিণ্ডার পাবার খরচপাতি এবং ঝুটঝামেলা ঢের। গ্রামাঞ্চলে মাঠঘাট ও বনজঙ্গল থেকে কাঠকুটো মেলে সহজে। গাঁয়েগঞ্জের বহু মানুষ তাই এখনও শুকনো ডালপালা, লতা, ঘুঁটে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গরিবি রেখার নিচের পরিবারগুলিতে এল পি জি সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ইনডাকশন কুকারের মতো বিকল্প সরঞ্জামের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। নজর পড়েছে শহরে পাইপবাহিত গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর দিকে। এর ফলে আরও বেশি গ্যাস সিলিন্ডার বরাদ্দ করা যাবে গ্রামের জন্য। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে আরও বহু বহু বাড়িতে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

ভারতের বিকাশ উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য সব ক্ষেত্রে শক্তিকে দক্ষভাবে কাজে লাগানো এক অন্যতম প্রধান উপায়। দেশের শহরাঞ্চলে বেড়ে চলা শক্তির চাহিদা আরও ভালোভাবে সামলানোর উদ্ভাবনামূলক পদ্ধতির বিকাশ ঘটানোও খুব জরুরি। বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

পরিবহণ ক্ষেত্রে সড়কের চেয়ে রেল বেশি কার্যকর। কিন্তু সড়ক পরিবহণের কাছে রেল পিছিয়ে পড়ছে, কারণ সড়ক পরিবহণ তার ব্যবহারকারীদের বেশ কিছু সুযোগ দেয়। আবার সড়কে যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার বাড়ছে আকছার। জন পরিবহনের হিস্যা কমছে। এক্ষেত্রে, জন পরিবহনের অংশভাগ বাড়ানোর জন্য উদ্ভাবনী মডেলের বিকাশ দরকার।

## কী করা দরকার?

শক্তি ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর সঠিক লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতির ব্যবস্থা ও কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। তবে বাছাই বা পছন্দ এবং গ্রহণ ও বিকল্প উপায় বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন নিষ্ঠার সঙ্গে করা চাই। স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি সন্তোষজনক হবার জন্য বাছাই-এর ব্যাপারে ভারসাম্য আনা হবে-এর লক্ষ্য। শক্তি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হওয়া দরকার গতিশীল (ডাইন্যামিক) ও নমনীয়, অর্থাৎ সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকবে এর।

এ ব্যাপারে অন্য দেশের অভিজ্ঞতা এবং চল থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের কাজে লাগতে পারে। এর পাশাপাশি, ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি রূপান্তর পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য পছন্দ বা বাছাই-এর বিশ্লেষণ ও সম্যক ধারণা পেতে তথ্য সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হবে। ভারতের প্রেক্ষাপটে কাজে লাগবে এহেন ব্যবসায়িক মডেলের উন্নয়ন ও উদ্ভাবনামূলক চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানানো দরকার।

সর্বোপরি, দীর্ঘ মেয়াদে টেঁকসই পথে এগিয়ে চলার জন্য বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের বৃহত্তর ফয়দা কাজে লাগাতে, অর্থনীতির উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে লগ্নির উদ্দেশ্যে চাই যথাযথ পরিকল্পনাও। ❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক গ্রিন গ্রোথ অ্যান্ড রিসার্চ এফিসিয়েন্সি ডিভিসন, টেরি-এর ডাইরেক্টর। ইমেল : ritum@teri.res.in)

**সহায়ক সূত্র :**

TERI. 2015. Energy Security Outlook: Defining a secure and sustainable energy future for India. New Delhi: TERI.

# শক্তি সুরক্ষার পথে উত্তরণ

*শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছে শক্তি উৎসগুলির উৎকর্ষতা ও অন্যান্য সুবিধার বিচারে। জ্বালানি কাঠ, মানুষের পেশি শক্তি ও গৃহপালিত জীবজন্তুর শক্তি ব্যবহারের আদিযুগ পেরিয়ে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে কয়েক শতক আগেই আমরা প্রবেশ করেছিলাম কয়লাভিত্তিক যন্ত্রশক্তির যুগে। কালক্রমে শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার পাশাপাশি সামনের সারিতে চলে আসে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। বর্তমানে বিবিধ সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, স্থায়ী শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস আগামীতে আমাদের শক্তি চাহিদা আদৌ মেটাতে পারবে না বা শক্তি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি। লিখেছেন—*****অধ্যাপক শান্তিপদ গণ চৌধুরী**

যেকোনও কাজ করতে গেলেই শক্তির দরকার, সেটা রান্নার কাজ বা সেচের কাজ বা যানবাহন চালানোর কাজ বা ঘরে আলো জ্বালানোর কাজ বা শিল্প কারখানা চালানোর কাজ, যেকোনও বিষয়ই হতে পারে। যুগ যুগ ধরে মানুষ বিভিন্ন শক্তির উৎস থেকে এই চাহিদা মিটিয়ে চলেছে।

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি পর্যায়ে উত্তরণ হয়েছে। প্রতিটি উত্তরণ হয়েছে শক্তি উৎসগুলির উৎকর্ষতা ও অন্যান্য সুবিধার বিচারে। বহুকাল আগে মানুষ তেল, কয়লা, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তথা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার জানত না। যদিও অপ্রত্যক্ষভাবে তারা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতো, কিন্তু ব্যবহারের পদ্ধতিগুলি ছিল উৎকর্ষতার নিরিখে খুবই নিম্ন মানের।

এককালে মানুষ শুধু জ্বালানি কাঠের শক্তি, মানুষের পেশি শক্তি আর গৃহপালিত জীবজন্তুর শক্তি ব্যবহার করত। এখনও এশিয়া, আফ্রিকার বহু দেশের মানুষ এইসব শক্তিই ব্যবহার করে দিনযাপনের প্রয়োজনে। এরা অত্যন্ত গরিব এবং আধুনিক সভ্যতার আলোক এখনও এদের কাছে পৌঁছয়নি। এদের চলে কীভাবে? কী এদের শক্তির উৎস? এরা কাঠ দিয়ে রান্না করে ও ঘর গরম রাখে, গরু-মোষ দিয়ে চাষবাস করে, উট বা ঘোড়া বা গরুর গাড়ির মাধ্যমে যাতায়াত করে, হাত পাখা দিয়ে গরমকালে হাওয়া খায়, বালতি দিয়ে কুয়ো থেকে জল তোলে ও রেড়ির তেল দিয়ে আলো জ্বালায়। আগেকার দিনে আমরা সবাই এই সব শক্তির উৎসগুলির সাহায্যেই জীবনযাপন করতাম। আদিবাসী অঞ্চলে এখনও লোকেরা কাঠের মশাল জ্বালিয়ে রাতের বেলায় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে। কাঠের ভিতর যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তা আসলে সৌর শক্তিরই একটি রূপভেদ। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সেই শক্তি সংগ্রহ করে। জ্বালানি কাঠ ছাড়াও যে শক্তির ব্যবহার সে সময় হ'ত, তা হল মানুষের পেশি শক্তি ও গৃহপালিত পশুর শক্তি। উদাহরণ—কুয়ো থেকে জল উত্তোলন, পাখা টানার কাজ, চাষের কাজ, ঘোড়ার গাড়ি, উঠের গাড়ি বা মাঝির নৌকা চালানো, পায়রার মুখে চিঠি পাঠানো, ঘানির তেল অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যত শক্তির প্রয়োজন প্রায় সবই আসত মানুষের পেশি শক্তি ও গৃহপালিত পশুর শক্তি থেকে। আজকে, একবিংশ শতাব্দিতেও কিন্তু এইসব শক্তির উৎস ব্যবহার হয়ে চলেছে। সারা বিশ্বের ৭০০ কোটি লোক এখনও শক্তির এইসব উৎসগুলি ব্যবহার করে। এই শক্তির উৎসগুলি ব্যবহারের কিছু ভালো দিক যেমন আছে ও কিছু সমস্যাও আছে। ভালো দিকটা হল, এইসব শক্তির উৎস (জ্বালানি কাঠ বাদে) ব্যবহার করলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না।

আগেই বলেছি, সমস্যা হল এই যে, এইসব শক্তি উৎসের কর্মক্ষমতা খুবই নিম্নমানের, বিশেষত যন্ত্রের সাথে তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে। উদাহরণ—একজন লোক সারদিন চেষ্টা করে নদী থেকে মাত্র ১২০ বালতি জল তুলে সেচের কাজ করতে পারে। অর্থাৎ, অত্যন্ত সক্ষমতাসম্পন্ন একটি লোক দিনে মাত্র ১২০০ লিটার জল তুলে সেচের কাজ করতে পারে। একটি লোকের সারাদিনের শ্রমের মূল্য হয় তো ৩০০ টাকা। সেখানে একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক পাম্প মাত্র এক ঘণ্টা চললে সমপরিমাণ জল তুলতে পারে। আর এই পাম্প এক ঘণ্টা চালাতে মাত্র ৫ টাকার বিদ্যুৎ খরচ হয়। মানুষ যখন যন্ত্রের আবিষ্কার করল, কখন পৃথিবীতে ঘটে গেল নিঃশব্দ এক বিপ্লব। সেই বিপ্লবকেই আমরা শিল্প বিপ্লব বলি। এই বিপ্লবের ফলে মানুষের কাজ করার ধরনটাই পালটে গেল। শিল্প বিপ্লবের শুরু ১৭৭৫ সালে। দেশের নাম গ্রেট ব্রিটেন। পরে সেই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে বেলজিয়াম, জার্মানি, ইটালি ও ফ্রান্সে ১৮৫০ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শিল্প বিপ্লবের জোয়ার আসে। হস্তশিল্পের পরিবর্তে বড় বড় যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বেশি হওয়ায় হস্তশিল্পীরা যন্ত্রের ব্যবহার করা শুরু করলেন। পেশি শক্তির ব্যবহার কমতে শুরু করে, যে ট্রেন ঘোড়ায় টানত, সেই ট্রেন চলতে শুরু করল কয়লার ইঞ্জিনে। আমরা কয়লার জগতে প্রবেশ করলাম। ১৮২৫ সালে প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চালু করলেন জর্জ স্টিফেনসন। উত্তর ইংল্যান্ডে প্রথম কয়লার ইঞ্জিনচালিত যাত্রী ট্রেন-এর

যাত্রা শুরু হয়। ঘোড়ায় টানা ট্রেনের ব্যবহার কমতে শুরু করে। তখন ট্রেনের বগিগুলি ছিল খোলা। কারখানাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় শহরায়ন। পরিবেশ দূষণও বাড়তে শুরু করল, কিন্তু আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগে প্রবেশ করলাম। আর সেই অর্থনীতি হল কয়লাভিত্তিক।

### কয়লা কি আগামী কয়েক বছরেই শেষ হয়ে যাবে?

উত্তর হল—না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, পৃথিবীতে যদিও কয়লা এই শতাব্দির শেষ পর্যন্ত থাকবে কিন্তু এর ব্যবহার, দাম, উত্তোলন পদ্ধতি ও কয়লার গুণগত মানে ঘটে যাবে বিরাট পরিবর্তন। আমাদের দেশে ১১০০ কেজি কয়লার দাম গত শতকের ৮০-র দশকে ছিল ২৫০ টাকা। আর আজ ৩০ বছর বাদে সেই একই পরিমাণ কয়লার দাম হয়েছে ৫০০০ টাকা, তাও কয়লার গুণগত মান ভালো নয়। ফলে, আমাদের দেশে এখন উত্তম মানের কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। উত্তম মানের কয়লা বলতে আমরা বুঝি যে কয়লা কেজি প্রতি বেশি তাপ শক্তি বহন করে ও যার মধ্যে অন্যান্য অশুদ্ধতা কম থাকে। পৃথিবীর সামনে ভীষণ এক আশু বিপদ হল জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনে কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবদানই সর্বাধিক। পরিবেশবিদদের দাবি, সারা পৃথিবী থেকে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনা হোক। গত ২০ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেকগুলি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে শক্তির উৎস হিসেবে পৃথিবীতে কয়লার ব্যবহার হয় তো এই শতাব্দির শেষভাগে আর থাকবে না। মনে রাখা দরকার কয়লাভিত্তিক উন্নয়ন স্থায়ী নয়।

### পৃথিবীর অভ্যন্তরে তেল কীভাবে তৈরি হয়?

কয়লার কথা খানিকটা বললাম। এবার আসা যাক তেলের গল্পে। তেল বলতে আমি পেট্রল, ডিজেল এইগুলির কথাই বলছি। এই তেলকে আমরা জ্বালানি তেল বলেই উল্লেখ করে থাকি। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে যে তেল প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার ব্যবহার হয়; সেই তেলের ব্যবহার কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম ১৮৫০ সাল নাগাদ। তেলের সৃষ্টির ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরনো দিনের গল্প। তেল তৈরি হয় গাছ বা জীবজন্তুর জীবাশ্ম থেকে। জীবাশ্ম থেকে তেল তৈরি হতে কিন্তু অনেক অনেক বছর লেগেছে। এইসব জীবজন্তুর বা বৃক্ষের মৃত্যু হয় প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে (১ মিলিয়ন, অর্থাৎ, ১০ লক্ষ)। সেসময় এইসব জীবজন্তুর মৃতদেহ সমুদ্র বা বড় জলাশয়ের নিমজ্জিত হয় এবং কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে এইসব জীবজন্তুর দেহের অংশবিশেষ পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের এইসব জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ-এর অংশবিশেষ থেকে তেল তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল তাপ শক্তির। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্বল্প গরমে এইসব জীবাশ্ম এক সময় পরিণত হয় তেল নামক এক তরল পদার্থে।

একবার তেল তৈরি হয়ে গেলে সেই তেল মাটি বা পাথর ফুড়ে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করে। কতকগুলি পাথর হয় permeable, অর্থাৎ, সেই সব পাথরের মধ্য দিয়ে তেল বা অন্য তরল পদার্থ চলাচল করতে পারে; আরেক ধরনের পাথর হল impermeable, অর্থাৎ, এর ভেতর দিয়ে তেল বা অন্যান্য তরল পদার্থ চলাচল করতে পারে না। এইসব impermeable পাথরের খাঁচায় তেল আটকে যায়। আর আটকে যাবার পর এই তেলকে আমরা বলি oil traps বা খাঁচাবন্দি তেল। এই খাঁচাবন্দি তেলকে আমরা যন্ত্রের সাহায্যে তুলে ব্যবহার করি। এই খাঁচাবন্দি তেল কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এত সুবিশাল পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই তেল পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু এখনও জানি না পৃথিবীতে বা সমুদ্রের তলায় কত পরিমাণ মজুত তেল আছে। শুধু অনুমান করতে পারি। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং তেল সব কিছুই এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হয়েছে। যেহেতু এরা জীবজন্তু বা বৃক্ষের অংশবিশেষ থেকে তৈরি হয়েছে, তাই এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বা ইংরেজিতে বলা হয় Fossil Fuels।

### তেল কবে আবিষ্কৃত হয়?

হাজার হাজার বছর আগেও কিন্তু পৃথিবীতে আমরা তেলের ব্যবহার করতাম।

**সারণি-১**
**পৃথিবীর কোন দেশ কত তেল ব্যবহার করে**

| দেশের নাম | মাথাপিছু প্রতি বছর |
|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৫ ব্যারেল |
| অস্ট্রেলিয়া | ১৭ ব্যারেল |
| ব্রিটেন | ১১ ব্যারেল |
| চিন | ২ ব্যারেল |
| ভারত | ১ ব্যারেল |

মূলত মিশর ও চিন দেশে সে সময় তেলের ব্যবহার হ'ত চিকিৎসার কাজে। কিন্তু সে সময় যে তেলের ব্যবহার হ'ত সেটা ছিল মাটির থেকে উপচে পড়া তেল। চিন দেশেই প্রথম মাটিতে ছিদ্র করে পাইপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ তেল উত্তোলন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-গর্ভের নিচে বেশি দূর যাওয়া যায়নি। সঠিক কারিগরি পদ্ধতিতে ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম তেল উত্তোলন করেন ফায়দোর সিমিয়নত্ নামে এক প্রযুক্তিবিদ। সেটা ছিল ১৮৪৬ সাল। অধুনা আজারবাইজানের বাকু শহরের কাছে এই ড্রিলিং যন্ত্রটি বসানো হয়েছিল। প্রথম তেল উত্তোলনের ড্রিল মেশিনটি মাটির নিচে প্রায় ৯০ ফুট পর্যন্ত গভীরে ছিদ্র করে তেল বের করেছিল। পরবর্তীকালে, ১৮৫৮ সালে উত্তর আমেরিকায় আরও বড় তৈল কূপ খনন করা হয়। প্রথম দিকে তেলের ব্যবহার হ'ত শুধুমাত্র বাতি জ্বালানোর কাজে। কিন্তু পরবর্তীকালে গাড়ি, জাহাজ বা অন্য কোনও ইঞ্জিন চালানোর জন্য তেলের ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থে পরিণত হল। তিমি মাছের তেল বা রেড়ির তেল ইত্যাদির ব্যবহার কমে গেল। প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে পৃথিবীর কোথায় কোথায় তেল-এর ভাণ্ডার আছে তা জেনে বিশ্ব জুড়ে তেল তোলার জন্য ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়ে গেল।

পৃথিবীতে যে সব দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি তেল পাওয়া যায় সেগুলি হল :

- সৌদি আরব
- ইরান
- ইরাক
- নাইজেরিয়া
- ভেনেজুয়েলা
- রাশিয়া

- সংযুক্ত আরব আমিরশাহী
- কানাডা

এইসব দেশগুলিতে অজস্র তেলের খনি আছে। মনে রাখতে হবে, মাটি খনন করে আমরা যে কালো তেল উত্তোলন করি তাকে বলা হয় ক্রুড অয়েল। সেটা সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। এর মধ্যে নানান উপসামগ্রী মিশ্রিত আছে যেগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এইসব খনির তেলকে বিভিন্ন তৈল শোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রুড তেল পাইপ লাইনের সাহায্যে, অথবা জাহাজে করে তৈল শোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

ক্রুড তেল থেকে কী কী জিনিস তৈরি হয়? এক নজরে তা দেখে নেওয়া যাক।

প্রায় ৫০ শতাংশ পেট্রোল, প্রায় ১৮ শতাংশ ডিজেল, প্রায় ১২ শতাংশ বিমানের জ্বালানি, বাকি ২০ শতাংশ থেকে রাস্তার নির্মাণ সামগ্রী, প্লাস্টিক, লুব্রিকেন্ট তৈরি হয়, যাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় মবিল বলি।

### তেল কত দিন থাকবে?

দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিই তেল বেশি ব্যবহার করে। অর্থাৎ, পৃথিবীর দূষণের জন্য তারই বেশি মাত্রায় দায়ি। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর ৭০০ কোটি লোক প্রতি বছর ৩০০০ কোটি ব্যারেল তেল ব্যবহার করে। পৃথিবীর তেল ভাণ্ডার সীমিত। যদিও পৃথিবীর বহু জায়গায় তেল ভাণ্ডার থাকার সম্ভাবনা রয়ে গেছে কিন্তু সবরকম হিসেব-নিকেশ করেও দেখা যায়, তেল ভাণ্ডার অচিরেই শেষ হতে চলেছে। ফলে সারা বিশ্বে তেলের দামের কোনও স্থিরতা থাকছে না। আমার মনে আছে ৭০-এর দশকে আমি ১ লিটার পেট্রোল কিনতাম ৩ টাকায়, আর আজকের দিনে ১ লিটার পেট্রোল কিনি ৮০ টাকায়।

তেল আর কতদিন থাকবে এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছে। বৈজ্ঞানিকদের হিসেব অনুযায়ী, ২০৭০ থেকে ২০৭৫ সালের মধ্যে পৃথিবীতে আর প্রাকৃতিক তেল থাকবে না। কিন্তু এই হিসেবটাও ঠিক থাকছে না, যদি আমাদের তেলের ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পায়। তেলের ব্যবহার কিন্তু দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে উয়ন্নশীল দেশগুলিতে; যার মধ্যে ভারত এবং চিনের নাম সবচেয়ে আগে বলতে হয়। সারা বিশ্বে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চাহিদা ২০২০ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৭০ শতাংশ। পৃথিবীর বহু দেশ এখনও তেল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে। তেলের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণের হারও বেড়ে গেছে মারাত্মকভাবে। এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য পৃথিবীতে চেষ্টা চলছে দু'রকমভাবে। প্রথমত, আরও বেশি তেলের খনি আবিষ্কার করা আর তেলের বিকল্প কিছু বের করা।

**সারণি-২**
**বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস থেকে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন**

| ক্রমিক নং | শক্তি উৎস | সম্ভাবনা (মেগাওয়াট) | বাস্তব উৎপাদন (মেগাওয়াট) |
|---|---|---|---|
| ১. | জৈবভর | ১৬,৮৮০ | ১,১০০ |
| ২. | জৈব বর্জ্য থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ | ৫,০০০ | ১,৬০০ |
| ৩. | বায়ুশক্তি | *৪৫,০০০ | ১৪,০০০ |
| ৪. | ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ | ১৫,০০০ | ৩,১০০ |
| ৫. | শহুরে এবং শিল্প বর্জ্য | ২,৭০০ | ৭৫ |
| ৬. | সৌরশক্তি | ৯০০,০০০ | ১,১৪০ |

**চিত্র-১**
**বাড়ির ছাদে বসানো ক্ষুদ্র সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র**

### বিকল্প শক্তি উৎস

দেখা যাচ্ছে স্থায়ী শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস কখনই আমাদের শক্তি চাহিদা মেটাতে পারে না বা শক্তি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস। উন্নত মানের প্রযুক্তির সাহায্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

- সৌর শক্তি (তাপ এবং বিদ্যুৎ)
- বায়ুশক্তি
- জৈবভর থেকে প্রাপ্ত শক্তি
- বাংলাদেশ ১ ব্যারেল প্রতি ৫ জন প্রতি বছর
- মধ্য আফ্রিকা ১ ব্যারেল প্রতি ২০ জন প্রতি বছর
- জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তি
- সমুদ্রের জোয়ারভাঁটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি
- ভূ-গর্ভস্থ তাপশক্তি
- হাইড্রোজেন থেকে প্রাপ্ত শক্তি
- সমুদ্রের উপরিতল আর গভীর জলতলের উষ্ণতার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত শক্তি

উপরে উল্লিখিত শক্তির উৎসগুলির মধ্যে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবভর থেকে প্রাপ্ত শক্তি, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তি কেন্দ্রগুলি

মোটামুটিভাবে বাণিজ্যিক শক্তির উৎস হিসেবে দেখা হয়। বাকি যে উৎসগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে এখনও যথাযথ বাণিজ্যিক শক্তির উৎস হিসেবে ধরা হয় না। আশা করা যায় এইসব উৎসগুলি আগামী দিনে বাণিজ্যিক পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে গণ্য করা হবে।

## সৌরশক্তি

পৃথিবীর সব শক্তির উৎসই সূর্য। সৌরশক্তি থেকে সরাসরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। আবার সৌর কোষের সাহায্যে সৌর আলোককে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা যায়। সৌরশক্তিই আবার পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। সৌরশক্তি থেকেই বাতাসের সৃষ্টি হয়। আমরা বায়ুশক্তি পাই। সৌরশক্তির তাপেই সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়। মেঘ তৈরি হয়, বৃষ্টি হয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তির মূল উৎসও সৌরশক্তি।

গত শতাব্দির শেষভাগ পর্যন্ত সৌরশক্তি থেকে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরির কথা খানিকটা ভাবনার মধ্যেই ছিল। কিন্তু পৃথিবী ব্যাপী শক্তি সংকট ও পরিবেশ সংকট থেকেই আমরা সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কথা উপলব্ধি করতে পারলাম। সারা বিশ্বে এখন দু'রকমভাবে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হয়।

(ক) সৌর তাপশক্তির সরাসরি ব্যবহার অথবা সৌর তাপশক্তির সাহায্যে বাষ্প তৈরি করে সেই বাষ্পকে দিয়ে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা।

(খ) সৌর কোষের সাহায্যে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা ও তার ব্যবহার।

সারা বিশ্বে বর্তমানে ব্যাপকভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে জার্মানি। ভারতবর্ষে বড় মাপের সৌরশক্তির ব্যবহার শুরু হয় ২০০৯ সাল থেকে। ভারতবর্ষে বড় মাপের সৌরশক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল পশ্চিমবাংলার আসানসোল শহরে। পরবর্তীকালে ভারতে জওহরলাল নেহেরু জাতীয় সৌর মিশন চালু করা হয়। এই প্রকল্পে ২০২২ সালের মধ্যে ২২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

**চিত্র-২**
**বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন**

নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে আরও স্বনির্ভর করে তোলা ও দেশকে সৌরশক্তির ব্যবহারে সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম সারিতে নিয়ে যাওয়া।

বর্তমানে পৃথিবীতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। আমাদের দেশে সেই হিসেবটা হল প্রায় ৩০,০০০ মেগাওয়াট। সারণি-২ থেকে কোন ধরনের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বর্তমানে ভারতে ব্যবহার হচ্ছে, তার একটা হিসেব পাওয়া যাবে।

পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস থেকে ভারতে কত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তারও একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

দেখা যাচ্ছে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির মধ্যে সৌরশক্তিই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। সৌরশক্তি ভারতকে দিতে পারে যথাযথ শক্তি সুরক্ষার সুযোগ। সৌরশক্তিকে আমরার দু'ভাবে ব্যবহার করতে পারি।

সৌরশক্তির বিশেষ গুণ হল এই যে,

- **এর থেকে কোনও দূষণ হয় না।**
- **সৌরশক্তি অফুরান ও সর্বত্র পাওয়া যায়।**
- **এই শক্তি ব্যবহারে শুধুমাত্র প্রাথমিক খরচটাই করতে হয়, পরবর্তী খরচ নামমাত্র।**

সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা হল এই যে, তা ছোটো বা বড় দুই-ই হতে পারে। বাড়ির ছাদে ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানো যায়। আবার মরুভূমি অঞ্চলে ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদনযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যায়। আশা করা যায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৌরশক্তি থেকে তৈরি করা হবে।

## বায়ুশক্তি

সৌরশক্তির মতন বায়ুশক্তিও স্থানীয়ভাবে লভ্য এবং দেশের শক্তি সুরক্ষা এক বড় ভূমিকা নিতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা-সম্পন্ন বায়ুশক্তিকেন্দ্র কাজ করে চলেছে। মূলত এই কেন্দ্রগুলি দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। কারণ সেখানে হাওয়ার গতিবেশ বেশি।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতবর্ষে প্রায় দু' লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বায়ুশক্তি থেকে উৎপাদন করা যেতে পারে। বায়ুশক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ তৈরি করার যন্ত্রগুলি এখন আমাদের দেশেই নির্মাণ করা হচ্ছে।

মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৯ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র কয়লা থেকেই এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না।

শক্তি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন ধীরে ধীরে কয়লা ও তেল নির্ভরতা কমানো ও সহজলব্ধ শক্তির উৎস, যেমন—সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তির উপর আরও বেশি নির্ভর করা। তাহলেই হয় তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এক সত্যিকারের উন্নত ভারত গড়ার ভিত উপহার দিয়ে যেতে পারব।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। তার নেতৃত্বেই ভারতের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পটি গড়ে ওঠে। তিনি দেশে-বিদেশের নানা নামী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত। রাষ্ট্রসংঘের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। ইমেল : nbirt2012@gmail.com)

# গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ : হালহকিকৎ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

*গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে ইতোমধ্যেই জাতীয় শুল্ক নীতির সংশোধন-সহ গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নীতি প্রণয়ন ও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, উদয়, উজালা-র মত নতুন নতুন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের দিশায় সেই পথে কী ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তথা তার সম্ভাব্য সমাধান সূত্রের সামগ্রিক চিত্রটি এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন—***শিরীষ এস. গরুড় ও প্রেরণা শর্মা**

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই (আদমশুমারি, ২০১১ ভিত্তিতে) হলেন দেশের ১৬.৭৮ কোটি গ্রামীণ পরিবারভুক্ত। এর মধ্যে মাত্র ৯ কোটি ২৮ লক্ষ ৮ হাজার ১৮১-টি গ্রামীণ পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, অবশিষ্ট বিদ্যুৎহীন পরিবারগুলির অধিকাংশই আলোর জন্য কেরোসিন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে থাকেন। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হিসাবে বিদ্যুৎকেই গণ্য করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে।

- ✶ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ পরিকাঠামো স্থাপন;
- ✶ গৃহস্থ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া;
- ✶ প্রয়োজনমাফিক কাঙ্ক্ষিত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- ✶ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ;
- ✶ পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ-বান্ধবতা ও দক্ষতা বজায় রেখে দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে বিদ্যুতের জোগান নিশ্চিত করা।

## গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের বর্তমান অবস্থা

ভারতের উন্নয়ন প্রয়াসে এক বড় চ্যালেঞ্জ নির্ভরযোগ্য শক্তি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জনবসতি রয়েছে এমন গ্রামগুলির ৯৮ শতাংশে বিদ্যুৎ গ্রিডের সম্প্রসারণ[১] ঘটলেও শেষ পর্যায়ের কাজের অসম্পূর্ণতার দরুন এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এবং আরও অনেক জনপদে, যেগুলির অধিকাংশই প্রত্যন্ত এলাকায়, আদৌ গ্রিড স্থাপিত হয়নি। ভারত সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী (এপ্রিল, ২০১৬)[২] প্রায় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ পরিবারকে এখনও অবধি গ্রিড বিদ্যুতের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। চালু পরিষেবায় ঘাটতি থাকার দরুন অনেক পরিবারকে দৈনিক চার ঘণ্টারও কম সময় বিদ্যুৎ জোগানো হচ্ছে। ২০০১ সালে সমগ্র পরিবারগুলির ৫৫.৮ শতাংশকে এবং ২০১১ সালে ৬৭.২ শতাংশকে বিদ্যুৎ পরিষেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। অতীতে বিষয়টির ওপর ঠিকমতো নজর দেওয়া হয়নি বলে বৈদ্যুতীকরণের কাজেও মন্থরতা এসেছে। এছাড়া অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলা, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ের বাধাবিপত্তি ইত্যাদিও কাজের অগ্রগতি বিলম্বিত করেছে।

## যেখানে বিদ্যুৎ নেই

বিদ্যুৎ সংযোগহীন যে অসংখ্য গ্রামীণ পরিবারের কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরি। ভারতে বিদ্যুতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষদের তিনটি ক্রেতাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যেতে পারে (পালিত, ২০১৫)।

(১) যেসব জনগোষ্ঠী প্রত্যন্ত ও দুর্গম গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং যেখানে কেন্দ্রীয় গ্রিড সম্প্রসারিত করা কারিগরি এবং আর্থিক—উভয় দিক থেকেই বাস্তবসম্মত নয়।

(২) যেসব জনগোষ্ঠী গ্রিডযুক্ত গ্রামগুলির সংযোগহীন ক্ষুদ্র জনপদের বাসিন্দা। এবং

(৩) গ্রামে গ্রিড পৌঁছনো সত্ত্বেও যেসব জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগহীন।

একাধিক সমীক্ষায়[৩] দেখা যায় যে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতা বহির্ভূত প্রায় ৩০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ১ কোটিরও কম মানুষ বসবাস করেন সেইসব গ্রামে যেখানে এখনও কেন্দ্রীয় গ্রিড অনুপস্থিত। বাকি ২৯ কোটি মানুষ থাকেন সেইসব গ্রামে যেখানে হয় বৈদ্যুতিক গ্রিড রয়েছে অথবা বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত বলে আদমশুমারিতে চিহ্নিত হলেও সেখানে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এ ধরনের বসতিগুলি সাধারণত পূর্ব-ভারতের অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো রাজ্য ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে যে আগামী তিন বছরের মধ্যে, ২০১৮ সালের আগেই অ-বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছনো হবে। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে আদমশুমারিতে বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত বলে চিহ্নিত অথচ বিদ্যুৎহীন গ্রামগুলিতে সংযোগ পৌঁছনোও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়।

## এক নজরে বিভিন্ন নীতি, প্রকল্প ও পদক্ষেপ

বিগত শতকের পঞ্চাশ দশকেই গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেলেও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হল ১৯৬৯ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতিক নিগম প্রতিষ্ঠা। নিগমের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের সর্বত্র গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণকে প্রসারিত করা ও অর্থ সাহায্য জোগানো। বিভিন্ন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ওই ধরনের সংস্থা বা বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের ঋণ সহায়তা দেওয়া ছাড়াও ওই নিগমের প্রধান কাজ হল কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের যাবতীয়

গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের উদ্যোগগুলিকে পরিচালিত করা। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজকে উন্নত ও জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি নীতি-কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এগুলির কয়েকটি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

● **জাতীয় শুল্ক নীতির সংশোধন :** ২০০৬ সালের জাতীয় শুল্ক নীতির সংশোধন হয়েছে সাম্প্রতিককালে। দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছনোর লক্ষ্যে সংশোধনীগুলিতে সুনির্দিষ্টভাবে মিনি (ক্ষুদ্র)-গ্রিডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে এই ধরনের গ্রিডের জন্য বিদ্যুৎ কেনার সংস্থানও রাখা হয়েছে।

সংশোধিত শুল্ক নীতির ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে : "...যেসব এলাকায় গ্রিড পৌঁছয়নি সেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মাইক্রো (অতি-ক্ষুদ্র)-গ্রিড স্থাপিত হবে। যেসব ক্ষেত্রে গ্রিডে যথোপযুক্ত বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও ওই নীতি প্রযোজ্য হবে। মাইক্রো-গ্রিড স্থাপনের কাজটি ব্যয়বহুল। এক্ষেত্রে বিনিয়োগে একটি ঝুঁকি হল প্রকল্প কার্য সম্পূর্ণ হবার আগেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় গ্রিডের স্থাপনা, যার ফলে মাইক্রো-গ্রিড থেকে সরবরাহ করা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি। এ ধরনের ঝুঁকির সমাধানে এবং মাইক্রো-গ্রিডে বিনিয়োগকে আকর্ষণীয় করে তুলতে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো থাকাটা খুব জরুরি। এর ফলে বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই ধরনের মাইক্রো-গ্রিডের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট আইনের ৬২ ধারা বলে ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষে ধার্য শুল্কের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেনা সম্ভব হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিনিয়ম ছয় মাসের মধ্যে জারি করা হবে।"

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি পৃথক নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সংশোধনীতে; যা কি না তাদের উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা দূর করার সহায়ক হবে।

মিনি-গ্রিড বা মাইক্রো-গ্রিডের কাজকে ত্বরান্বিত করে তাদের নিজেদের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে কয়েকটি রাজ্য আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের মিনি-গ্রিড নীতি গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনের খসড়া 'মিনি-গ্রিড পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়মনীতি, ২০১৬'-ও ঘোষিত হয়েছে চলতি বছরের ৪ মার্চ তারিখে।

● **গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নীতি, ২০০৫ :** ২০০৫ সালে ঘোষিত গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নীতির প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল সুলভ দামে ভালো মানের নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ২০০৯ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দেওয়া। ২০১২ সালের মধ্যে জীবনযাপনের প্রয়োজনে পরিবারপিছু দৈনিক ন্যূনতম ১ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের কথাও নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ডেটা বা উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওই লক্ষ্য এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের নীতিতে বিদ্যুদায়িত গ্রামের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছিল। নীতি অনুযায়ী, গ্রাম পঞ্চায়েতের শংসাপত্রের ভিত্তিতে কোনও গ্রাম বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত কিনা তা যাচাই করা হবে। শংসাপত্রে বিদ্যুৎ বণ্টন ট্রান্সফর্মার, বণ্টন লাইন ইত্যাদি মৌলিক পরিকাঠামো জনপদটিতে রয়েছে কিনা এবং ন্যূনতম একটি দলিত বসতি বা গ্রামে সেগুলির উপস্থিতি রয়েছে কিনা; বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত কার্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সমষ্টি কেন্দ্র ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে কিনা, এবং বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যার অন্তত ১০ শতাংশ কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। ২০০৫ সালে ওই সংজ্ঞা প্রযুক্ত হবার পর দেশে বিদ্যুৎ সংযোগহীন গ্রামের সংখ্যাটি হঠাৎ করে বেড়ে যায়।

● **রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনা :** ২০০৯ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩ এবং ২০০৫ সালের গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নীতিতে বলা হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনার সূচনা হয়েছিল ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে। বলা হয়েছিল সমগ্র দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ সংযোগহীন গ্রাম ও জনপদে পরিবারগুলির জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই প্রকল্প রূপায়ণে নোডাল বা প্রধান এজেন্সির ভূমিকায় থাকবে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নিগম।

● **দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা :** রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনার এক্তিয়ারকে আরও সম্প্রসারিত করে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নতুন কর্মসূচি, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার[৪] সূচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ তথা প্রধান কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সকলের জন্য ২৪ × ৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। কর্মসূচিটির এক্তিয়ারভুক্ত কয়েকটি বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে :

- ✶ কৃষি এবং অ-কৃষি ফিডারগুলিকে পৃথক করে গ্রামাঞ্চলে বিচক্ষণতার সঙ্গে কৃষি এবং অ-কৃষি ক্রেতাদের রোস্টারভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ✶ বণ্টন ট্রান্সফর্মার, ফিডার ও ক্রেতাদের মিটার ব্যবস্থা-সহ সমগ্র সাব-ট্রান্সমিশন ও বণ্টন পরিকাঠামো আরও মজবুত ও উন্নত করা।
- ✶ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ১ আগস্ট, ২০১৩ সালে জারি হওয়া অনুমোদনপত্র অনুযায়ী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ যোজনায় রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনার গ্রামীণ লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ করা হবে এবং এই যোজনা ও তার জন্য বরাদ্দ অর্থকে নতুন চালু হওয়া দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার দু'টি উপাদান রয়েছে। এগুলি হল ফিডার পৃথকীকরণ ও ২০১৯ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ—যে দু'টি লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ যোজনায় ছিল না। নতুন গ্রাম জ্যোতি যোজনায় একদিকে গ্রামীণ পরিবারগুলির স্বার্থে বিদ্যুৎ সরবরাহে উন্নতিসাধনের লক্ষ্য রয়েছে, অন্যদিকে পিক বা সর্বোচ্চ লোড হ্রাস করারও উল্লেখ রয়েছে।

● **উজ্জ্বল ডিসকম (DISCOM) আশ্বাস যোজনা (উদয়) :** কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে উজ্জ্বল ডিসকম আশ্বাস যোজনা (উদয়)[৬]। একটি যুগোপযোগী সংস্কার বলে 'উদয়'-কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজ্য নিয়ন্ত্রিত ডিসকমগুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজ্য

**চিত্র-১**
**ভারতে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ**

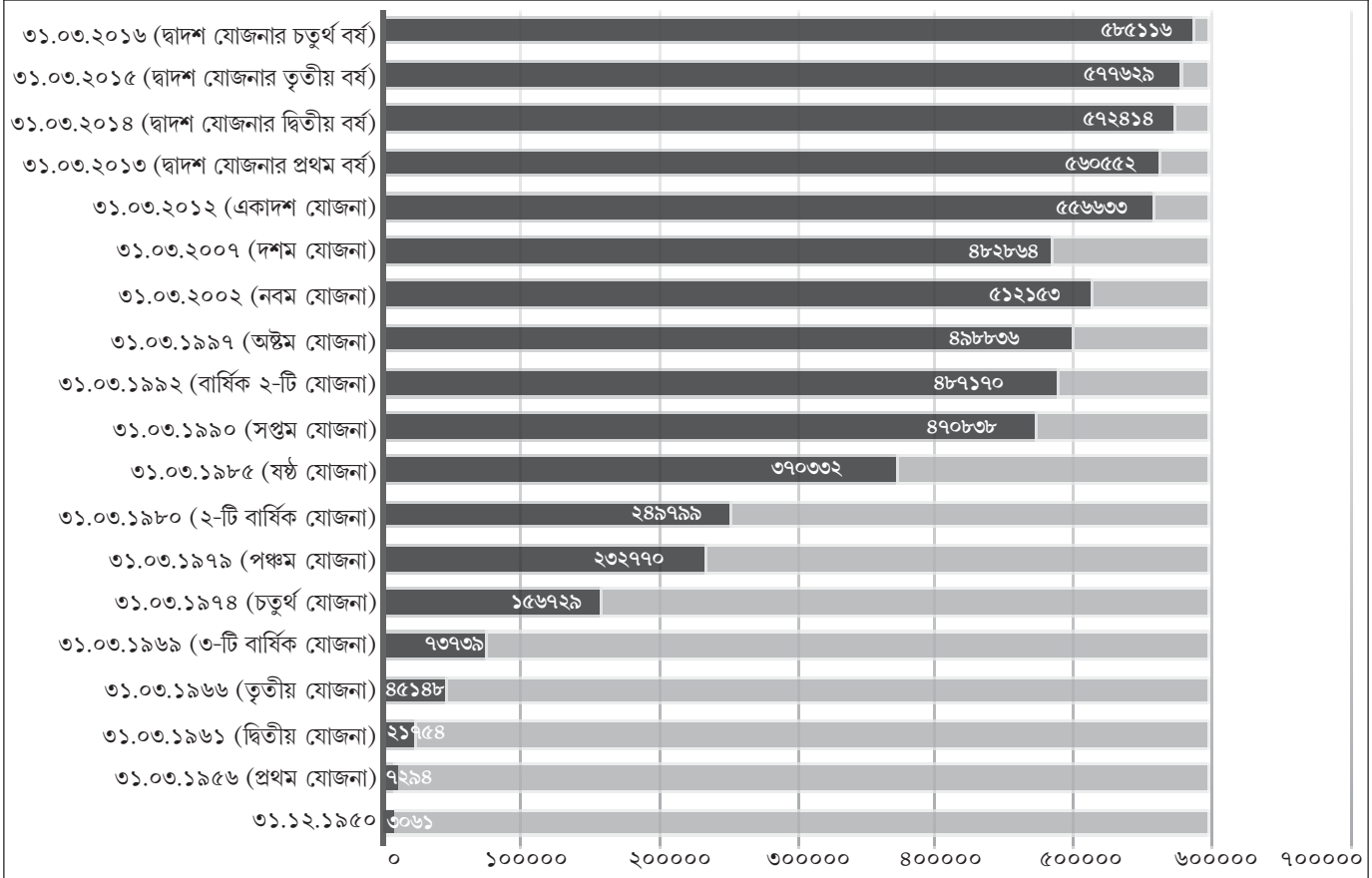


**সূত্র** : কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক (এপ্রিল, ২০১৫)
**টীকা** : উল্লেখিত তারিখ সংশ্লিষ্ট বর্ষ/পঞ্চবার্ষিকী বা বার্ষিক যোজনার সমাপ্তির দিন।

নিয়ন্ত্রিত ডিসকমগুলি বর্তমানে ঋণ জর্জরিত এবং প্রতি বছর এগুলির ক্ষতির অঙ্ক বেড়েই চলেছে। পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় মূলত লক্ষ্য রাখা হচ্ছে রাজ্য সরকারগুলি যাতে পূর্ব সংজ্ঞায়িত পদ্ধতিতে ডিসকমের ঋণের বোঝা অধিগ্রহণ করে নেয়। এজন্য ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর অবধি বকেয়া ঋণের ৫০ শতাংশ অধিগ্রহণ করার কথা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকের মধ্যে, এবং ২৫ শতাংশ করার কথা জুন, ২০১৬ সালের মধ্যে। এভাবে জুন, ২০১৬ সালের মধ্যে ডিসকমগুলির ঋণের ৭৫ শতাংশ রাজ্য সরকারগুলির হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে ঋণের বোঝা কাটিয়ে ২-৩ বছরের মধ্যে 'ব্রেক ইভেন'-এ পৌঁছনোর লক্ষ্যে ডিসকমগুলির ক্ষেত্রে চারটি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এগুলি হল :

(১) ডিসকমগুলির পরিচালনাগত দক্ষতার মানোন্নয়ন করা।

(২) বিদ্যুতের খরচ কমানো।

(৩) ডিসকমগুলির সুদবাবদ খরচ কমানো।

(৪) রাজ্য অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিসকমগুলিতে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে দশটি রাজ্য (বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড)। আরও আটটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত এলাকা উদয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে সম্মতি দিয়েছে। আর্থিক সঙ্কোচন ও ক্রমপুঞ্জিত ঋণের বোঝা রাজ্য কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যের উদ্যোগে ২০১৫-১৬ সালে এক ট্রিলিয়ন ভারতীয় অর্থ মূল্যের উদয় বন্ড ছাড়া হয়েছে।

● **উজালা :** সরকারি প্রয়াসে শুরু হয়েছে লাইট এমিটিং ডায়োড বা এলইডি-ভিত্তিক ঘরবাড়ি ও রাস্তা আলোকিত করার জাতীয় কর্মসূচি। উদ্দেশ্য হল শক্তির ব্যবহার কমানো ও শক্তি সংরক্ষণ। পাশাপাশি ভারত সরকারের সংস্থা শক্তি দক্ষতা পরিষেবা লিমিটেড বা ইইএসএল চালু করেছে এলইডি বাল্ব বণ্টন কর্মসূচি। গার্হস্থ্য আলোর সুদক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত এই কর্মসূচি ২০১৫ সালের মার্চে শুরু হয়। এ বছরের মার্চে জাতীয় এলইডি বাল্ব কর্মসূচির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিশারী হিসাবে উজালার উল্লেখ করতে হয় (সুলভ এলইডি-র সাহায্যে সকলের জন্য উন্নত জ্যোতি)। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সুদক্ষ আলোকিতকরণ ব্যবস্থা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষিত করা। এই কর্মসূচির আওতায় গত বছরের মার্চ মাস থেকে পর্যায়ক্রমে এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হচ্ছে। গার্হস্থ্য আলোর সুদক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মসূচিটি বর্তমানে ৯টি রাজ্যে রূপায়িত

হচ্ছে। সেগুলি হল, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ড। চলতি বছরের ২৮ জুন পর্যন্ত, হিসাব অনুযায়ী, মোট ১২.৩ কোটি এলইডি বাল্ব বিতরিত হয়েছে এবং এর ফলে দৈনিক ৪.৩ কোটি কিলো ওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে ও সর্বোচ্চ চাহিদার থেকে ৩২০৫ মেগাওয়াট এড়ানো সম্ভব হবে[৭]।

## আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় গ্রিড সম্প্রসারণের মধ্যবর্তিতায় গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কাজে যেসব বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেগুলি হল—অত্যধিক প্রকল্প ব্যয় ও ভরতুকিপ্রাপ্ত মাশুলের ফলে কম আয়; বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে সরবরাহ ছাঁটাই; এবং যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত ব্যয়ভার। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের সুসাধ্য ও সুস্থায়ী লক্ষ্যপূরণে প্রয়োজন রয়েছে গ্রাম এলাকার অর্থনীতিকে মজবুত ভিতের ওপর স্থাপন করা এবং সেখানে আয়বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার। এটা করতে পারলে গ্রামের মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থেই পরিষেবা ব্যয় বহন করতে এগিয়ে আসবেন। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণে জোর দিতে হবে জাতীয় সৌর মিশনের রূপায়ণ এবং মিনি ও মাইক্রো গ্রিডগুলিকে প্রচলিত গ্রিডগুলির সঙ্গে যুক্ত করার ওপর। গুরুত্ব দিতে হবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসগুলির ওপরও। যেহেতু গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের অন্যতম লক্ষ্য হল গ্রাম এলাকার মানুষদের আর্থিক উন্নয়ন, তাই এই কাজের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পগুলিকেও অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : শিরীষ এস. গরুড় ও প্রেরণা শর্মা যথাক্রমে TERI-র 'ইনার্জি-এনভায়রনমেন্ট টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ডিভিসন'-এর ডাইরেক্টার তথা সিনিয়ার ফেলো ও রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। ইমেল : shirishg@teri.res.in, prerna.sharma@teri.res.in)

**উল্লেখপঞ্জী :**

১ As per Ministry of Power, Government of India, 2016
২ http://garv.gov.in/dashboard (Accessed on July 4, 2016)
৩ Palit (2015)
৪ http://www.ddugjy.gov.in/mis/portal/memo/DDUGJY-OM.pdf (Accessed on July 4, 2016)
৫ http://www.ddugjy.gov.in/mis/portal/memo/DDUGJY_Guidelines.pdf
৬ http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid-130261
৭ http://www.ujala.gov.in (Accessed on June 28, 2016)


# *লক্ষ্য যখন W.B.C.S Officer হওয়া*

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চপদে নিয়োগের জন্য আগামী 29'শে জানুয়ারী (সম্ভাব্য) 2017'তে Preliminary Exam.'হতে যাচ্ছে। আগ্রহী পরীক্ষার্থীরা প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হতে চাইলে প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আর আপনার প্রচেষ্টাকে সফল করতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সফল প্রস্তুতির জন্য Cognition(A unit of M.K.S- N.G.O)'এর উদ্যোগে W.B.C.S-2017'এর জন্য আমাদের 'Expert Group'এর পরিচালনায়- 'Free Seminar', অত:পর Complete Full- Time Coaching' এর ভর্ত্তির প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। নাম নথিভুক্ত (Free Seminar) ও ভর্ত্তির জন্য দ্রুত যোগাযোগ করুন।

**Cognition'এর কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য :-**

- Class'শুরুর প্রথমেই কার্যকরী পাঠক্রমের নিখুঁত রূপরেখা দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রতি Class'এর মধ্যে তার সুসামঞ্জস্যপূর্ন বিভাজন করা হয়।
- W.B.C.S-'A'Grade' এ সফল এবং একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান দানে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞদের দ্বারা Class'করানো হয়।
- প্রতিটি বিষয় পঠনান্তে সফল 'Expert Group'এর দ্বারা প্রস্তুত প্রকৃত পরীক্ষার সঙ্গে সযুজ্যপূর্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'Mock Test' নেওয়া হয়। 'Make-Shift'গোছের 'Test' নয়।
- কোনো বিষয় শুরু হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়ান্তরে কখনো যাওয়া হয় না।
- প্রতিটি- 'Class'এর 'Audio-Backup' Library'তে রাখা হয় অনুপস্থিত কিংবা পুন:পাঠে আগ্রহীদের জন্য।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই বিল্ডিং, বিজ্ঞাপন, সফলদের ছবি, এবং তাদের নিয়ে Institute'এর কথা, গালভরা আশ্বাস- ''ভর্ত্তি মানেই সরকারী চাকুরীর নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া'' ইত্যাদি কোনো কিছুই আপনাকে সফলতা এনে দিতে পারবে না। আপনাকে সফলতা দিতে পারে সফলপ্রাপ্ত পাঠদানের নিপুন দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তাদের পড়ানোর মান, গভীরতা, উপযোগীতা ইত্যাদি গুনগুলি যা আমাদের একমাত্র মূল্যবান সম্পদ। বাকী সব বিতত বিতংস!

**COGNITION (A Unit of M.K.S)**

**BEHALA & MIDNAPORE**

**Contact:- 9851040683, 7044792283, 8670179028**

পাঠক্রম পরিচালনা :- বিপ্লব পইড়্যা (G.S), উপল মান্না (Optional); 'এক্সপার্ট গ্রুপ' পরিচালনায় :-মীণাক্ষী বোস (অবৈতনিক);
'টিম' :- রাজীব শ্রাবন- ছায়া প্রকাশনীর কেরিয়ার বুক লেখক (অবৈতনিক); ভাষা বিভাগ পরিচালনা :- অধ্যাপক বনোজ চক্রবর্ত্তী (অবৈতনিক)।

# ভারতে শেল গ্যাস ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা

*এদেশে শক্তি সম্পদের ভাণ্ডার সীমিত। তাই সরকারকে গুণতে হয় বিরাট অঙ্কের আমদানির মাশুল। আমদানির ওপর এই অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে এবার শক্তির অচিরাচরিত উৎসগুলিকে কাজে লাগানোর দিকে যথা সম্ভব নজর দেওয়া দরকার। শেল গ্যাসের মতো অচিরাচরিত প্রাকৃতিক গ্যাসগুলি যে দেশের শক্তি নিরাপত্তা বজায় রাখার অন্যতম উপায় হতে পারে, মার্কিন দেশের অভিজ্ঞতায় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। মার্কিন দেশের সাফল্যের অভিজ্ঞতা কি প্রযোজ্য হবে ভারতে? এদেশে শেলের উৎপাদনের সম্ভাবনা ও আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন—*****অনিল কুমার জৈন** ও **রাজনাথ রাম**

শক্তিসম্পদ ব্যবহারের নিরিখে বিশ্বে চিন ও আমেরিকার পরেই তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত (সূত্র : বিপি স্ট্যাটিসটিক্যাল রিভিউ, ২০১৬)। কিন্তু এদেশে শক্তিসম্পদের ভাণ্ডার সীমিত। শক্তি সম্পদের জন্য আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে দেশের আর্থিক সুস্থিতি বার বার বিপন্ন হয়। কারণ, বিশ্ব বাজারে শক্তি সম্পদের মূল্য ক্রমাগত ওঠানামা করতেই থাকে। দেশের শক্তি নিরাপত্তার ওপরও এর আঁচ পড়ে। আর্থিক বিকাশের হার ৮ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিসমূহের যোগান সুনিশ্চিত করা এবং সেইসঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে শক্তি সম্পদের ব্যবস্থা করাটা দেশের সামনে আজ বড় চ্যালেঞ্জ।

এর জন্য একদিকে যেমন শক্তিসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়িয়ে এর চাহিদা বৃদ্ধির ওপর রাশ টানতে হবে, তেমনই অন্যদিকে আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে দেশে শক্তিসম্পদের উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে। শক্তি সম্পদের ব্যবহারের ওপর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-এর বিকাশ হারের নির্ভরশীলতার মাত্রার ওপর নির্ভর করছে শক্তিসম্পদের চাহিদা বৃদ্ধিতে কতটা লাগাম পরানো যাবে। এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা আলো জ্বালানো/তাপ উৎপাদন/শীতলীকরণ এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। শক্তিসম্পদ নির্ভরতার বিষয়টি পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের ওপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, ২০১১-১২ সালে আমাদের আমদানি নির্ভরতা যেখানে ছিল ৭৩ শতাংশ সেখানে দ্বাদশ পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ (২০১৬-'১৭) এই নির্ভরতা ৮০ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বেশ কিছু এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে পেট্রোলিয়ামের বদলে অন্য কোনও জ্বালানির ব্যবহার সম্ভব নয়। যানবাহন, বিশেষ করে ভারী যানবাহনের (হেভি ডিউটি ভেহিকল্‌স বা HDV) ক্ষেত্রে জ্বালানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

***"২০১৫ সালে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ঐতিহাসিকভাবে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে বিশ্বজুড়ে এখন যা গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে আশা করা হচ্ছে যে আগামী দিনে গ্যাসের ব্যবহার আরও বাড়বে। একদিকে এর জোগান ও ব্যবসাও বাড়ছে। অন্যদিকে এটি অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধবও বটে।"***

মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট হারে ভারতের আর্থিক বিকাশ হার যেহেতু বজায় থাকছে তাই প্রাথমিক ব্যবহার কমার সম্ভাবনা কম। ২০১৫ সালে এদেশে প্রাথমিক শক্তির ব্যবহার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ ওই বছরই চিন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং জাপানে প্রাথমিক শক্তির ব্যবহার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.২ শতাংশ, –১.৯ শতাংশ, –৩.৩ শতাংশ এবং –১.২ শতাংশ। ২০১৫ সালে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ঐতিহাসিকভাবে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে বিশ্বজুড়ে এখন যা গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে আশা করা হচ্ছে যে আগামী দিনে গ্যাসের ব্যবহার আরও বাড়বে। একদিকে এর জোগান ও ব্যবসাও বাড়ছে। অন্যদিকে এটি অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধবও বটে। শিল্পমহল যদি আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার (IEA) প্রস্তাবিত 'আদর্শ নিয়মাবলী' মেনে চলে তাহলে ২০৩৫ সালে বিশ্বের শক্তি সম্পদের ভাণ্ডারে গ্যাসের অংশভাগ বর্তমানের ২৩ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ কয়লাকে (২৪ শতাংশ) পেছনে ফেলে তেলের (২৭ শতাংশ) পরেই প্রাথমিক শক্তির দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসাবে চিহ্নিত হবে গ্যাস। এই বিষয়টিতে উৎসাহিত হয়েই ২০১২ সালের এক প্রকাশনায় বিশ্ব শক্তি সংস্থা জানিয়েছে যে, গ্যাস ব্যবহারের

চিত্র-১
২০৩৫ সালে অচিরাচরিত গ্যাস উৎপাদক দেশসমূহ
(আন্তর্জাতিক শক্তিসংস্থার আদর্শ নিয়মাবলী অনুযায়ী)

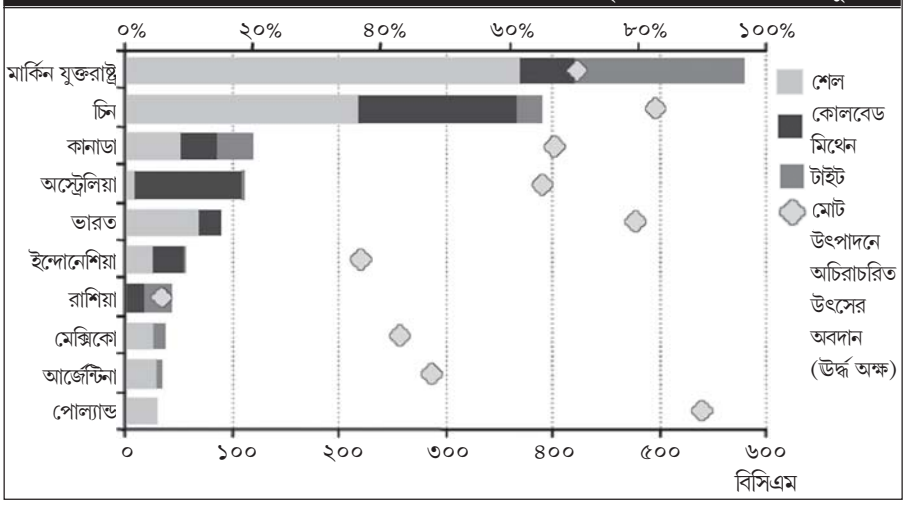


এক সুবর্ণ যুগে প্রবেশ করতে চলেছে বিশ্ব। প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে বিভিন্ন অচিরাচরিত গ্যাসের অংশভাগ ২০১০ সালে ছিল ১৪ শতাংশ। ২০৩৫ সালে তা ৩২ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে। ফলে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অচিরাচরিত গ্যাস, বিশেষ করে শেল গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে শক্তির জোগান বাড়াতে শক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসটিকে যথাসম্ভব কাজে লাগানোর জন্য অনুকূল প্রযুক্তির ব্যবহারের উপযুক্ত নীতি প্রণয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ নীতি রচয়িতারা।

## অচিরাচরিত গ্যাসের উৎস কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

অচিরাচরিত গ্যাসগুলি এমন কিছু ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে যার নিষ্কাশন বেশ শ্রমসাধ্য। অর্থাৎ, অন্যান্য উৎস থেকে শক্তিসম্পদ উত্তোলন বা নিষ্কাশনের চেয়ে গ্যাস নিষ্কাশনের জন্য পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি। বিশেষ পরিস্থিতিতে, এগুলির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ প্রযুক্তিরও প্রয়োজনও হয়। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উৎসগুলিকে অচিরাচরিত গ্যাসের উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়।

- কোল বেড মিথেন,
- কোল মাইন মিথেন,
- শেল গ্যাস,
- টাইট গ্যাস।

২০১০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে গ্যাসের চাহিদা ৫০ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২০৩৫ সালে এই চাহিদার এক-তৃতীয়াংশই অচিরাচরিত উৎসগুলি থেকে মিটবে বলে আশা। অথচ কয়েক বছর আগেও আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অচিরাচরিত গ্যাসগুলির বিশেষ কোনও ভূমিকাই ছিল না। মার্কিন দেশে শেল থেকে গ্যাসের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পর ছবিটা একদম বদলে যায়। বিশ্বজুড়ে অচিরাচরিত গ্যাসগুলি নিয়ে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ২০০০ সালে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে ২০১০ সালে আমেরিকায় শেল গ্যাসের উৎপাদন ২৩ শতাংশে পৌঁছে যায় এবং ২০৩৫ সালে এই শেল গ্যাস সেদেশে মোট প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের অর্ধেক দখল করে নেবে বলে অনুমান। কোল বেড মিথেন, টাইট গ্যাস ও অন্যান্য অচিরাচরিত গ্যাসগুলি ২০৩৫ সালে আমেরিকার মোট প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ৭০ শতাংশ দখল করে নেবে বলে আশা। গ্যাসের এই নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়ার ফলে আমেরিকা আমদানিকারকের বদলে আজ গ্যাসের রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছে। শেল গ্যাস ছাড়া, অচিরাচরিত গ্যাসের অন্যান্য উৎসগুলির সঙ্গে ভারত পরিচিত।

*"২০১০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে গ্যাসের চাহিদা ৫০ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২০৩৫ সালে এই চাহিদার এক-তৃতীয়াংশই অচিরাচরিত উৎসগুলি থেকে মিটবে বলে আশা। অথচ কয়েক বছর আগেও আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অচিরাচরিত গ্যাসগুলির বিশেষ কোনও ভূমিকাই ছিল না। মার্কিন দেশে শেল থেকে গ্যাসের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পর ছবিটা একদম বদলে যায়।"*

বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের পাললিক শিলা, যেমন বেলে পাথর, চুনা পাথর, শেল পাথর ইত্যাদিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত থাকে। বেলে পাথরে ছিদ্র বেশি থাকায় এই পাথর অনেক বেশি ভেদ্য। অর্থাৎ এই পাথরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এর ফলে সঞ্চিত গ্যাস পাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। কিন্তু শেল পাথরের ভেদ্যতা খুব কম। ফলে এই পাথরের স্তরে অনেকটা জায়গা জুড়ে গ্যাস ক্রমাগত সঞ্চিত হতেই থাকে। এর থেকে গ্যাস নিষ্কাশন প্রক্রিয়া যেমন জটিল তেমন ব্যয়সাধ্যও বটে। হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং (ফ্র্যাকিং) প্রযুক্তিতে অগ্রগতির ফলেই সাম্প্রতিক কালে শেল গ্যাসের এই বহুল ব্যবহার। কারণ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে খননকূপের (ওয়েল বোর) চারদিকে কৃত্রিমভাবে ফাটল ধরানো সম্ভব হয়েছে। পলিগঠিত অববাহিকাগুলিতেই শেল পাথর থাকে এবং একটি কুঁয়ো খোঁড়ার সময় যে পাথর উঠে আসে তার ৮০ শতাংশই এই শেল। বিশ্বের বেশিরভাগ এলাকাতেই জৈববস্তু সমৃদ্ধ শেল শনাক্ত করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জানা যেতে পারে যে কোন

ধরনের শেলে গ্যাস রয়েছে, কোথায় রয়েছে তেল আর কোন স্তরেই বা সঞ্চিত রয়েছে গ্যাস ও তেলের মিশ্রণ। কিন্তু শেল স্তরের মধ্যে কতটা গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে এবং প্রযুক্তিগত ভাবে কতটা গ্যাস নিষ্কাশন ব্যয়সাশ্রয়ী হবে তা জানতে গেলে আগে পরীক্ষামূলকভাবে বেশ কিছু কূপ খনন করতে হবে। গ্যাসের মধ্যে ঘনীভূত বাষ্প বা কনডেনসেট-এর পরিমাণ এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে। উৎপাদন ব্যয়সাশ্রয়ী হবে কিনা তা কনডেনসেট-এর পরিমাণের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ শক্তিসম্পদের বাজারে কনডেনসেট-এর দাম অনেক।

সাম্প্রতিককালে মূলত তিনটি কারণে শেল গ্যাসের উৎপাদন ব্যয়সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে।

- আনুভূমিক ড্রিলিং প্রযুক্তিতে অগ্রগতি;
- হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং;
- বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি।

আনুভূমিক ড্রিলিং এবং হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং প্রযুক্তি আমেরিকায় শেল গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করেছে। শুধু তাই নয়, এর ফলে আলাদা আলাদা খনন কূপগুলি থেকে মোট গ্যাস নিষ্কাশনের সম্ভাবনাও ৫৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র-১-এ ২০৩৫ সালে বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে শেল গ্যাস উৎপাদনের একটা সম্ভাব্য পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

গত ২০১৩ সালের জুনে প্রকাশিত মার্কিন এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (EIA) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৭৫৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (tcf) শেল গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে এবং এই সঞ্চয়ভাণ্ডার ছড়িয়ে রয়েছে ৪৮-টি দেশে (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের EIA-এর সংশোধিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ধারযোগ্য শেল গ্যাসের পরিমাণের বিচারে চিন রয়েছে প্রথম স্থানে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে গত বছর পর্যন্ত প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ধারযোগ্য শেল গ্যাসের পরিমাণের বিচারে আমেরিকা ছিল দ্বিতীয় স্থানে কিন্তু বর্তমানে আমেরিকা চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে।

আমেরিকার শেল গ্যাস ক্ষেত্রের বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগে চিন যে বিনিয়োগ করেছে তা মার্কিন দেশের মোট বিদেশি বিনিয়োগের ২০ শতাংশ। এই বিনিয়োগের ফলে চিন যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা চিনের দেশীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপখননের ব্যয় অনেক কমানো যেতে পারে। শেল গ্যাস উৎপাদনে উৎসাহ দিতে ২০১২ সালে চার বছর মেয়াদি এক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে চিন সরকার। চিনের যে সমস্ত সংস্থা বাণিজ্যিকভাবে শেল গ্যাসের উৎপাদন শুরু করবে তাদের প্রতি মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (MmBtu) পিছু ১.৮০ ডলার ভরতুকি দেওয়ার কথা রয়েছে এই কর্মসূচিতে। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি এই ভরতুকির হার কিছুটা কমানো হলে এই কর্মসূচির মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

## শেল গ্যাস নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা : আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় শেল গ্যাস নিষ্কাশনের সমস্যা অনেক বেশি। গ্যাসের চিরাচরিত উৎসগুলির তুলনায় শেল গ্যাস একদম আলাদা। এছাড়া এই গ্যাসের অবস্থান পুরোটাই স্থলভাগে হওয়ার দরুণ পারিপার্শ্বিকের ওপর এই গ্যাস নিষ্কাশনের প্রভাবও পড়ে অনেক বেশি। প্রযুক্তিগতভাবেও এই গ্যাস নিষ্কাশন বেশ কঠিন। এই গ্যাসের সঞ্চয়ভাণ্ডার অত্যন্ত শক্তপোক্ত। তাই সঞ্চয়ভাণ্ডারের বড় অংশে আনুভূমিকভাবে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। কখনও কখনও আবার একাধিক ফাটল সৃষ্টি করতে হয় এবং ঘন ঘন যন্ত্রকে প্রবৃত্ত বা স্টিম্যুলেট করার দরকার পড়ে। প্রথম এক থেকে দুই বছরে শেল গ্যাসের কূপ থেকে খুব বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয়। পরবর্তীকালে বহু বছর ধরে একটু একটু করে গ্যাস নির্গমণের পরিমাণ কমতে থাকে। এই কারণেই একসঙ্গে অনেকগুলি কূপ খনন করার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে জনগোষ্ঠী, পরিবেশ সুরক্ষা ও গ্যাস নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা—

**সারণি-১**
**প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ধারযোগ্য শেল গ্যাসের পরিমাণের নিরিখে প্রধান প্রধান দেশ**

| ক্রমিক নং | দেশ | প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ধার-যোগ্য শেল গ্যাস (ট্রিলিয়ন ঘনফুট) |
|---|---|---|
| ১. | চিন | ১,১১৫ |
| ২. | আর্জেন্টিনা | ৮০২ |
| ৩. | অ্যালজেরিয়া | ৭০৭ |
| ৪. | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬২৩ |
| ৫. | কানাডা | ৫৭৩ |
| ৬. | মেক্সিকো | ৫৪৫ |
| ৭. | অস্ট্রেলিয়া | ৪২৯ |
| ৮. | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯০ |
| ৯. | রাশিয়া | ২৮৫ |
| ১০. | ব্রাজিল | ২৪৫ |
| ১১. | ভারত | ৯৬ |
| | **বিশ্ব (মোট)** | **৭৫৭৬** |

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপর আরও বেশি করে জোর দিতে হয়।

শেল গ্যাস উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়, এর জীবনচক্রের সঙ্গে জড়িত আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলিকে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হল।

- ড্রিল প্যাড নির্মাণ ও তা চালানো;
- হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং এবং গড়িয়ে আসা জল নিকাশের ব্যবস্থাপনা;
- ভূ-গর্ভস্থ জলদূষণ;
- আগুন ধরা ও বাড়িতে বিস্ফোরণ;
- জলের ব্যবহার ও সরবরাহ;
- চুঁইয়ে পড়া বিভিন্ন বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনা ও ভূ-পৃষ্ঠের জলের সুরক্ষা;
- বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ;
- স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব।

শেল গ্যাসের নিষ্কাশনের সময় উচ্চচাপে যে ফ্র্যাকচারিং তরল সঞ্চয়ভাণ্ডারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল মিশে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। আনুভূমিক শেল স্তরে যে গ্যাস আবদ্ধ রয়েছে তা যাতে শেলগ্যাস ধারণকারী এলাকায় আনুভূমিক ড্রিলিং-এর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় তা সুনিশ্চিত করা দরকার। উচ্চচাপে থাকা জলের সঙ্গে বালি/সেরামিক

ব্যবহার করলে শেলস্তরে ফাটল ধরানো কিছুটা সহজ হয় এবং এর ফলে ফাটলগুলিতে বালির যে তলানি পড়ে তার সাহায্যে ফাটলগুলি উন্মুক্ত হয়ে থাকে এবং গ্যাস সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে নির্গত হয়ে আনুভূমিক কূপগুলিতে চলে যায়। ফাটল সৃষ্টি করার জন্য তরলে বালি/সেরামিকের বদলে রাসায়নিকের মিশ্রণও দেওয়া যায়। তবে বালির ব্যবহার ও শিলা স্তরে ফাটল সৃষ্টি করার এই প্রক্রিয়া নিয়েই আশঙ্কার অবকাশ রয়ে যায়। কারণ এর থেকে ভূগর্ভের জলস্তরে দূষণ ছড়াতে পারে। আর এই জলের ওপরই নির্ভর করছে পৃথিবীর জীবকুলের অস্তিত্ব। ফাটল সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় যদি কোনও ত্রুটি রয়ে যায় তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে অগভীর স্তরগুলিতে। সেই সঙ্গে এই কাজে ব্যবহৃত ও রাসায়নিকগুলিও একসঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকী অগভীর স্তরের এই ফাটলগুলির মধ্যে দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে ভূগর্ভের জলস্তরে দূষণও ছড়াতে পারে।

জলদূষণের আশঙ্কা ছাড়াও শেলগ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রতি কূপের হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং-এর জন্য প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। এর পরিমাণ কয়েক হাজার থেকে ২০ হাজার ঘনমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এত জলের জোগান এবং ফ্র্যাকচারিং-এর পর সেই জলের নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্থানীয় পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও বিশালায়তন এলাকা জুড়ে শেল গ্যাসের অনুসন্ধান চালাতে হয়। তেল বা গ্যাসের অন্যান্য চিরাচরিত উৎসগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই। ভারতের মতো দেশে যেখানে জমির ওপর জনসংখ্যার এত বেশি চাপ, সেখানে শেল গ্যাসের অনুসন্ধান বেশ কঠিন। এমনিতে চিরাচরিত গ্যাস ক্ষেত্রগুলিতে ১০ বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশন করা যায় এবং তার জন্য ১০০-৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার লাইসেন্স নিলেই চলে। কিন্তু শেলের ক্ষেত্রে বিশাল এলাকার প্রয়োজন পড়ে। যেমন, আমেরিকা মার্সেলাস শেল গ্যাস ক্ষেত্রটি ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া একাধিক স্তরে (১০-২০-টি স্তর) ফাটল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিটি কূপের জন্য এক হাজার থেকে চার হাজার টন পর্যন্ত তরলের (ফ্লুইড বা প্রপান্ট) প্রয়োজন হয়। শিলা স্তরে ফাটল সৃষ্টির জন্য উচ্চচাপে তরল ঢোকানোর এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকম্পের আশঙ্কাও রয়ে যায়। এই সমস্ত কারণেই অনেক দেশই শেল গ্যাস অনুসন্ধানে অনুমোদন দেওয়ার আগে দশবার ভেবেছে। এর ফলে গত বছর জার্মানিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন প্রায় ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শেল গ্যাস এবং হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং প্রক্রিয়াকে ঘিরে নানা বিতর্কের কারণে চিরাচরিত গ্যাসের উৎপাদনও মার খেয়েছে। শেল গ্যাস নিয়ে তর্ক-বিতর্কের কারণে গত তিন বছরের চিরাচরিত গ্যাস উৎপাদনের অনেক প্রকল্পই বাধা পেয়েছে যেগুলিতে হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিটি দেশকেই শেল গ্যাস অনুসন্ধান ক্ষেত্রে একটি নিয়মবিধি স্থির করে দিতে হয়; যেখানে উপযুক্ত নিয়ামক ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ, শেল গ্যাস অনুসন্ধানের এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশের যাতে কোনও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি না হয় তা সুনিশ্চিত করার সমস্ত উপায় থাকা চাই। ভারতে জলের ভাণ্ডার ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। তাই এ বিষয়ে মৌলিক সমীক্ষা চালানো, জলের গুণমানের ওপর নজরদারি ও জলের ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

**সারণি-২**
**ভারতে পাললিক অববাহিকায় সঞ্চিত শেল গ্যাসের আনুমানিক হিসাব**

| | | |
|---|---|---|
| ১ | মেসার্স স্লামবার্জার | ৩০০-৪০০ TCF |
| ২ | এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (EIA), আমেরিকা (৪-টি অববাহিকা—ক্যাম্বে অনল্যান্ড, দামোদর, কৃষ্ণা-গোদাবরী অনল্যান্ড এবং কাবেরী অনল্যান্ড) | ৫৮৪ TCF |
| ৩ | ONGC—৬-টি অববাহিকা | ১৪৭.৫ TCF |
| ৪ | সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট (CMPDIL) ৬-টি উপ-অববাহিকা | ৪৫ TCF |
| ৫ | ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS) ৩-টি অববাহিকা | ৬.১ TCF |

## ভারতে শেল গ্যাসের ভাণ্ডার

শেল পাথর আদতে এক ধরনের মৌলিক বা প্রাথমিক শিলা। এই শিলা যে গ্যাসের সঞ্চয় ভাণ্ডার সম্প্রতি তা অনুধাবন করা গেছে। তাই যে সমস্ত দেশে হাইড্রোকার্বন উৎপাদন হয় সেই সমস্ত দেশে শেল শিলা স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় হাইড্রোকার্বন যে জমা থাকবে তা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। এমনকী যে সমস্ত অববাহিকায় অন্য কোনও গ্যাস উৎপাদন হয় না সেখানকার শেল স্তরেও হাইড্রোকার্বন সঞ্চিত থাকতে পারে। তাই শুধু গ্যাস উৎপাদক ৭-টি পাললিক অববাহিকা নয়, দেশের ২৬-টি অববাহিকাতেই শেল গ্যাস থাকার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে তেল/গ্যাস উৎপাদনের আগে অনুসন্ধান ও উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে সংশ্লিষ্ট শেল স্তরের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে নিতে হবে।

স্থলভূমিতে অবস্থিত বিভিন্ন উৎস থেকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতের। যে ৭-টি অববাহিকা থেকে বর্তমানে তেল/গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে মাটির গভীরে বহু দূর পর্যন্ত শেল পাথরের উপস্থিতির বিষয়টি বেশি করে নজরে এসেছে। কারণ এই অববাহিকাগুলিতে অনুসন্ধানের কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবে এ দেশে সঞ্চিত তেল/গ্যাসের প্রকৃত পরিমাণ জানা যায়নি। বিভিন্ন সংস্থার তরফে বিভিন্ন হিসাব পেশ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য সারণি-২)।

৩-টি অববাহিকায় মাত্র ৬.১ TCF শেল গ্যাসের উপস্থিতির হিসাব দিয়েছে ইউনাইটেড

স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (USGS)। আবার ২০১৩ সালের জুনে EIA-এর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এদেশে শেল গ্যাসের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৮৪ TCF হলেও প্রযুক্তিগতভাবে উদ্ধারযোগ্য শেল গ্যাস রয়েছে ৯৬ TCF (ক্যাম্বে, কৃষ্ণা-গোদাবরী, কাবেরী, দামোদর উপত্যকা, উচ্চ অসম, প্রাণহিতা-গোদাবরী, রাজস্থান ও বিন্ধ্য অববাহিকায়)। আমেরিকার দুই সংস্থার হিসাবের মধ্যে এই বিপুল পার্থক্য ভারতীয় প্রশাসকদের মনে যে দ্বিধা সৃষ্টি করেছে তা এখনও মেটেনি। তবে এই দু'টি সংস্থার প্রতিবেদনের মধ্যে তুলনা টানাটা খুব একটা সমীচীন হবে না। কারণ USGS-এর প্রতিবেদনে শুধুমাত্র গ্যাসের অনাবিষ্কৃত উৎসগুলির কথাই বলা হয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন EIA-এর প্রতিবেদনে সেই সমস্ত উৎসগুলির কথাই বলা হয়েছে যেখান থেকে গ্যাস উদ্ধার প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভবপর। অর্থাৎ, যে উৎসগুলি ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত বা উৎপাদন শুরু না হলেও যে উৎসগুলির অস্তিত্ব প্রমাণিত, একমাত্র সেগুলিই স্থান পেয়েছে EIA-এর প্রতিবেদনে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অচিরাচরিত গ্যাসের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের সেই অর্থে নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি নেই। এখানে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা মূল্যায়নের পালা চলে। তাই এখানে 'অনাবিষ্কৃত' এবং 'আবিষ্কৃত হলেও উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত নয়' এই কথাগুলোর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা রয়েই যায়।

গত কয়েক দশক ধরে ভারতের জাতীয় তেল সংস্থাগুলি স্থলভূমিতে বিরাট আকারে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছে। এরপর উৎপাদন ও বণ্টন চুক্তির (প্রোডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট—PSC) জমানা শুরু হওয়ার পর বেসরকারি সংস্থাগুলিও এই কাজে এগিয়ে এসেছে। দেশে, বিশেষ করে ক্যাম্বে, কৃষ্ণ-গোদাবরী এবং কাবেরী অববাহিকায় কয়েক হাজার কূপ খনন করেছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। এই উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন পাললিক অববাহিকায় শেল শিলা স্তরের গঠন, গভীরতা ও বিস্তৃতির বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এখনও স্থলভূমির বেশিরভাগ অববাহিকায় শেল গ্যাস সঞ্চয়ের পরিমাণটা পুরোপুরি যাচাই করা যায়নি। এমনকী কেরোজেন উপাদান বিশ্লেষণের জন্য খনন করা কূপগুলিকেও ঠিক মতো সংরক্ষণ করা হয়নি। অনুসন্ধানের জন্য নয়া লাইসেন্সের জমানা বা নিউ এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্সিং রেজিম (NELP) এবং প্রাক্-NELP আমলে স্থলভূমিতে যে বিপুল সংখ্যক কূপ খনন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত সমস্ত নথি ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হাইড্রোকার্বন (DGH)-এর কাছে জমা রয়েছে এবং দেশের স্থলভূমি সম্পর্কিত যেকোনও গবেষণা কাজ বা প্রচারের জন্য এই নথি অবাধে ব্যবহার করা যায়। দেশে শেল গ্যাস উৎপাদনের সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়ার জন্য এই নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

এছাড়াও, ONGC-র কর্পোরেট তথ্য ভাণ্ডার EPINET (অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এরও অনুরূপ একটি তথ্য ভাণ্ডার রয়েছে) ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নেটওয়ার্কে প্রচুর প্রাসঙ্গিক তথ্য আপলোড করেছে। শেল গ্যাস অনুসন্ধান কর্মসূচিগুলিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে জাতীয় তেল সংস্থাগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় উপরোক্ত তথ্য ভাণ্ডারগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

তবে এখানে মূল সমস্যা শেল গ্যাসের বৈচিত্র্য এবং উপযুক্ত ফ্র্যাকচারিং প্রযুক্তি নিয়ে। তাছাড়া কতখানি শেল গ্যাস প্রযুক্তিগত দিক থেকে উদ্ধারযোগ্য তার মূল্যায়নের জন্য প্রচুর সংখ্যক কূপ খননের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রতি একক অচিরাচরিত গ্যাস উৎপাদনের খরচও অনেক বেশি। কারণ, বহু ব্যয় করে খনন করা কূপগুলি থেকে গ্যাস নিষ্কাশনের হার ৩৫-৪০ শতাংশেরও কম, মার্কিন দেশে তো কোনও কোনও কূপে গ্যাস নিষ্কাশনের হার মাত্র ৮ থেকে ১৯ শতাংশ। সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে গ্যাস নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকে ব্যয়সাশ্রয়ী করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন ও মূল্য নির্ধারণের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তবে গ্যাস ব্লকগুলির জন্য নিলাম ডাকার ক্ষেত্রে কীভাবে শেলের সঞ্চয় সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা হবে সেই সমস্যাটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে।

## শেল গ্যাস সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের প্রস্তুতি

শেল গ্যাস অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় একাধিক সমস্যা রয়েছে। এই কাজে হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং প্রযুক্তির ব্যবহারকে ঘিরেই মূল সমস্যা। এছাড়া সহায়সম্পদের মূল্যায়ন, একটি নিয়ামক ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষার নিয়মাবলী প্রণয়ন, উন্মুক্ত জমির জোগান, জলের ব্যবস্থা, ভূকম্পন নিয়ে উদ্বেগ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে শেল গ্যাসের ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে কি না এই নিয়েই যাবতীয় তর্ক-বিতর্ক। আমেরিকায় শেল গ্যাসের উৎপাদন অত্যন্ত সফল হয়েছে। তবে ভারতে ভূ-প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমেরিকার দৃষ্টান্ত এখানে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যায় না। তবে আমরা ইতিমধ্যেই অপর একটি অচিরাচরিত গ্যাস—কোল বেড মিথেন (CBM) নিষ্কাশনে সফল হয়েছি। এতে আমাদের অচিরাচরিত গ্যাস নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মূল্যবান অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

শেল গ্যাস সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার প্রথম ধাপ হিসাবে বিধিবদ্ধ কাঠামো এবং তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান সম্পর্কিত চালু নীতিটিকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে; সেগুলি আদৌ শেল গ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কি না। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালের তৈলক্ষেত্র নিয়ামক আইনে এবং ১৯৫৯ সালের প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিতে 'প্রাকৃতিক'-ভাবে উৎপন্ন সমস্ত গ্যাসকেই প্রাকৃতিক গ্যাসের তকমা দেওয়া হয়েছে। বিধিবদ্ধ এই ব্যাখ্যা অনুসারে কোল বেড মিথেনও কয়লামন্ত্রকের আওতায় না এসে, চলে এসেছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের আওতায়। কারণ, এই গ্যাসটি উৎপন্ন হয় প্রাকৃতিকভাবে। এমনকী NELP-এর আওতায় তেল ও গ্যাসের ব্লক নিলামের সময় এটাও বোধহয় জানানো হয়েছিল যে কোল বেড মিথেনও NELP-এর উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (PSC) মধ্যে পড়বে। পরে যদিও কোল বেড মিথেনের জন্য স্বতন্ত্র একটি নীতি প্রণয়ন করা হয় এবং NELP ও উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতা থেকে কোল বেড মিথেনকে বাদ দেওয়া হয়। NELP জমানা শুরু হওয়ার

আগে ONGC বা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি মনোনীত জমানা বা 'নমিনেশন রেজিম'-এ যে ব্লকগুলি পেয়েছিল সেখানে শেল গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদনের ব্যাপারে ২০১৩ সালে অনুমতি দেয় সরকার। তবে NELP জমানায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বরাত পাওয়া ব্লকগুলির ক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নীতি, বিশেষ করে অনুসন্ধান সম্পর্কিত শর্তগুলি মেনে চলতে হচ্ছে চুক্তিকারীদের। ফলত, নিলাম হওয়া ব্লকগুলির ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কার্যের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেগুলিতে আর নতুন করে শেল গ্যাসের অনুসন্ধান চালানো যায় না। সম্প্রতি অনুমোদিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের লাইসেন্স নীতি আওতায় (হাইড্রোকার্বনস লাইসেন্সিং পলিসি—HELP) সামগ্রিকভাবে হাইড্রোকার্বনের অনুসন্ধানকার্য চালানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। পূর্ববর্তী নীতিগুলির তুলনায় এই নতুন নীতিটি শেল গ্যাসের অনুসন্ধানের কাজে অনেক বেশি সহায়ক হয়ে উঠবে।

জমি ও জলের জোগান নিয়েও এ দেশে বিস্তর সমস্যা। একথা মোটামুটি সবার জানা যে, মার্কিন দেশে জমির মালিক বা রাজ্য সরকার বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে থাকা জমিতে যা যা খনিজ পদার্থ মিলবে তার সম্পূর্ণ মালিকানা সংশ্লিষ্ট পক্ষের। কিন্তু ভারতের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব স্তরে লাইসেন্স প্রদান করে শেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ প্রশস্ত করতেই পারে। কিন্তু যেখানে অনুসন্ধান চালানো হবে সেই জমিতে যারা বাস করে আসছে তাদের সরানো এখানে বিরাট সমস্যা। আমেরিকায় জমির মালিকরা তাদের জমিতে অনুসন্ধান কার্য চালানোর জন্য তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে থাকে। কারণটা তাদের আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। জমির মালিকদের এই সহযোগিতার ফলেই সে দেশে শেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কর্মসূচি এত দূর এগোতে পেরেছে। অন্যদিকে ভারতে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, কৃষিকাজের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার কারণে শেল গ্যাস নিষ্কাশন কর্মসূচি এখানে বাধা পাচ্ছে।

জলের জোগানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিনের সিচুয়ান অববাহিকায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা এ দেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিনে এই অঞ্চলে প্রথম শেল গ্যাসের অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছিল। কারণ এই অঞ্চলে জলের প্রাচুর্য রয়েছে এবং জলের উৎসের কাছে অঞ্চলটি অবস্থিত।

জলদূষণ এবং শিলা স্তরে উচ্চচাপে হাইড্রলিক তরল ঢোকানো তথা পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও ভারত ও পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে তা বোঝা দরকার। আমেরিকায় পরিবেশ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন তো রয়েছেই এবং সেই সঙ্গে, এ বিষয়ে প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিয়মবিধি জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে।

তেল ও গ্যাস সংক্রান্ত বিশেষ আইন/বিধি প্রণয়নের দায়িত্ব সেখানে মূলত রাজ্যগুলির। এছাড়া লাইসেন্স প্রদান, তেল ও গ্যাসের উৎপাদন তথা পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিভিন্ন নিয়মবিধি প্রয়োগের জন্য রয়েছে নিয়ামক সংস্থাগুলি। কূপের চারপাশে সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ, কূপগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ, হাইড্রলিক ফ্র্যাকচারিং, বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা, কূপগুলি থেকে রাসায়নিক পদার্থ বা জল চুঁইয়ে আসা ঠেকাতে ফাটল রোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে এ সংক্রান্ত বিধি-নিয়মের আওতায়। এই সমস্ত বিধি-নিয়মের সঙ্গে পরিবেশ বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধি-নিয়মগুলি যুক্ত হয়ে একটি সর্বাত্মক আইনগত ও নিয়ামক কাঠামো তৈরি হয়েছে। উপরোক্ত নিয়ম-বিধি তো রয়েছেই, এছাড়াও, আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মতো শিল্পসংস্থাগুলি নিজেরাই শেল-কেন্দ্রিক কর্মসূচির মাপকাঠি স্থির করে নিয়েছে। ভারতেও পরিবেশ রক্ষার জন্য নিয়মবিধি জারি বা আইন প্রণয়ন করতে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই ধরনের আইনগত কাঠামো বর্তমান এবং ভারতেও প্রয়োজনের উপযোগী করে অনুরূপ একটি কাঠামো গড়ে তোলা খুব একটা সমস্যার হবে না। IEA-এর নির্দিষ্ট প্রকাশনায় যে আদর্শ নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তার মধ্যে শেল গ্যাস নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থার কাজে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা গেলে হাইড্রলিক তরলের প্রকৃতি, ভূ-কম্পনের আশঙ্কা, জলদূষণ, মিথেন নির্গমণের মতো সমস্যাগুলি এড়ানো যাবে। এই সমস্যাগুলি যে শুধু শেল গ্যাস নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেই দেখা দেয় এমনটা নয়। কোল বেড মিথেন নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও ভূ-গর্ভের অগভীর স্তরে প্রচুর জল ব্যবহার করতে হয় (ভূ-গর্ভের অগভীর স্তর হওয়ার দরুন শেল গ্যাস নিষ্কাশনের চেয়েও এই কাজে ঝুঁকি অনেক বেশি)। তবে কোল বেড মিথেন নিষ্কাশনে ভারতের এক দশকব্যাপী অভিজ্ঞতা মোটেই নেতিবাচক নয়। তবে শেল গ্যাস নিষ্কাশনের কাজে পুরোদস্তুর নামার আগে সরকারের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য নথিপত্র খতিয়ে দেখা দরকার। পরিবেশের ওপর কোল বেড মিথেনের প্রভাব ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার চার বছরের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলারের তহবিলের সংস্থানও রেখেছে সে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

## পরিশেষে

শেল গ্যাস কর্মসূচিতে পরিবেশ রক্ষার ওপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে ভারতকে। জনসাধারণের সক্রিয়তা, বিচার-বিভাগের কড়া নজরদারি এবং সীমিত জমি/জল সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে শেল গ্যাসের অনুসন্ধান নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। জাতীয় স্তরে ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের আদলেই রচিত। শিল্পক্ষেত্র থেকে বায়ু, জল নির্গমণের একটা মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত আইনে। শেল গ্যাসের ক্ষেত্রে মাত্রা তো বটেই এমনকী, নির্গমণের প্রক্রিয়াও স্থির করে দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমের দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে

শিল্পক্ষেত্রের বেঁধে দেওয়া একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি উতরোতে হবে এমনটা ধরেই নিয়েই কাজ করে সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থাগুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতে শিল্পসংস্থাগুলির কাছ থেকে এই মনোভাব আশা করা যায় না এবং প্রতিটি পদে তাদের জন্য নিয়মাবধি জারি করতে হয়। তাছাড়া শেল গ্যাস শিল্পের জটিল প্রকৃতির জন্য রাজ্যগুলির পক্ষে নিয়মবিধি জারি করা সম্ভব হয় না, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই তা করা সম্ভব। তবে জল ও জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি যেহেতু স্থানীয় স্তরের তাই এই সমস্ত নিয়মবিধি প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট নিয়মবিধি জারির আগে স্থানীয় স্তরে জল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নেওয়া প্রয়োজন, যেমন, জলের সঞ্চয়, জলের প্রকৃতি ইত্যাদি।

এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে রাজ্য/জেলাস্তরে মানবসম্পদের আরও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। শেল গ্যাস অনুসন্ধানের পথে শুধু যে চুক্তি সংক্রান্ত, আর্থিক বা প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা নয়, পরিবেশ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলিও কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ভারতে তেল ও গ্যাসের উৎপাদন এক জায়গায় থেমে থাকায় যেভাবে আমদানির মাশুল গুণতে হচ্ছে তাতে এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠে শেল গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত।❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : অনিল কুমার জৈন নীতি আয়োগের শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা। ইমেল : anilk.jain@nic.in
রাজনাথ রাম নীতি আয়োগের যুগ্ম উপদেষ্টা। ইমেল : rajnath-pc@nic.in

**তথ্য সূত্র :**

https://www/kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/shale-gas-global-perspective.pdf

2. Golden Rules for Golden Age of Gas-IEA, 2012
3. Shale Gas Resources : An Assessment of 137 Shale Formations nin 41 Countries Outside the United Statges-EIA-2013
4. Evaluating production potential of mature US oil, gas shale plays 12/03/2012 (Oil & Gas Journals)
5. http://www.shale-gas-information-platform.org/areas/basics-of-shale-gas.html
6. Wintershall : Shale gas controversy blocking conventional production (Oil & Gas Journals)
7. Director General of Hydrocarbons
8. BP Statistical Review, 2016

**WBCS এবং IAS—'Anthropology Optional'**

**প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষক উপল মান্না।**

***Upal Manna, M.Sc. Gold Medalist in Anthropology. Specialist teacher to teach 'Optional Anthropology' for 'Civil Services'.***

*প্রাক্তন শিক্ষক,* **Haldia Govt. College**
*প্রাক্তন শিক্ষক,* **Maharishi Institute (MCDP)**

Anthropology বিষয়টি পড়া, বোঝা ও মনে রাখা অনেক সহজ এবং যথেষ্ট নম্বর পেতে সাহায্য করে। কারণ এই বিষয়টিতে রয়েছে উপজাতিদের জীবন কাহিনি, মানবসমাজ ও সংস্কৃতি এবং মানুষের বিবর্তন ও জৈবিক বৈচিত্রের কথা॥

*IAS এবং WBCS দিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের জন্য কথা বলুন॥*

*—ঃঃ যোগাযোগ ঃঃ—*

9231921650 • 9007917562 • 8337062060

# সাফল্যের জন্য চাই স্পেশালাইজড গাইডেন্স

গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার্স করার পর চাকরি প্রার্থীরা চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে থাকে। এই পড়াশোনা কিন্তু স্কুল-কলেজ স্তরের পড়াশোনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতির অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গিটা সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া প্রয়োজন, নতুবা সাফল্য অধরা থাকবে কিংবা আসতে বিলম্ব করবে। বর্তমানে স্কুল সার্ভিস এবং অন্যান্য রাজ্য স্তরের চাকরি পরীক্ষার অনিশ্চয়তা বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রতি আকর্ষিত করছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মেধার চাকরি প্রার্থীদের কাছে ডব্লুবিসিএস-ই হল এখন একমাত্র অবলম্বন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ডব্লুবিসিএস-ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রিতা ডব্লুবিসিএস-এ আর থাকছে না, এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং গ্র্যাজুয়েশনের পর চার বছর ধরে মাস্টার্স– বিএড করে স্কুল সার্ভিসের অপেক্ষায় না থেকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতিতে নেমে পড়া শুধু ভালোই নয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতি নিলে মিসলেনিয়াস, ক্লার্কশিপ, ব্যাঙ্ক, সাব-ইন্সপেক্টর— পুলিশ/ফুড প্রভৃতি পরীক্ষাগুলিতে সাফল্য পাওয়া যায় অনায়াসে। ডব্লুবিসিএস-এর সিলেবাসে সম্প্রতি সরলীকরণ ঘটেছে, MCQ প্রশ্নের প্রবেশ ঘটেছে মেনসেও। সিলেবাসের এরূপ পুনর্বিন্যাসের ফলে ডব্লুবিসিএস-এর পাশাপাশি সিজিএল, রেল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কেন্দ্রীয়স্তরের পরীক্ষাগুলিতেও সাফল্য পাওয়া যাবে একই প্রস্তুতিতে। অপশনালের বোঝাও লাঘব হয়েছে অনেকটা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ডব্লুবিসিএস-এর ক্ষেত্রে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর কাজ করছে। আর যারা এই পরীক্ষাকেই টার্গেট করছে তাদের সামনে রয়েছে 'Win-Win Situation'।

ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য **অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন** যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে ডব্লুবিসিএস-এর ২০১৪-র চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১২০ জনেরও বেশি এবং মিসলেনিয়াস ২০১২-তে ৫২ জন।** সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা।

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক, কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং-স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন—সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তারা। দুই, এখানে শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএস পড়ানো হয়। সেই অর্থে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল ডব্লুবিসিএস স্পেশালাইজড্ সংস্থা। বর্তমান যুগ হল স্পেশালাইজেশনের যুগ। তাহলে ডব্লুবিসিএস গাইডেন্সের জন্য স্পেশালাইজড সংস্থা নয় কেন?

## প্রিলিম -২০১৭ মক টেস্ট

আপনি কি ডব্লুবিসিএস ২০১৭ প্রিলি পরীক্ষায় বসছেন? আপনার প্রস্তুতি সঠিক পথে চলছে কিনা তা জেনে নেওয়া একান্তই জরুরি। বারবার মকটেস্ট দিয়ে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন, আর নিজের নেট স্কোরকে রাখুন কাট অফের ওপরে। একমাত্র আমাদেরই সুপরিকল্পিত এবং স্ট্যান্ডার্ড মকটেস্টগুলি পারে এ বছর আপনার প্রিলির বাধাকে অতিক্রম করাতে। মকটেস্টের প্যাকেজে থাকছে—

- **১৫টি ২০০ নম্বরের হুবহু প্রিলির অনুরূপ মক টেস্ট।**
- **কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস।**
- **সাফল্যের টিপস সংক্রান্ত স্পেশাল ক্লাস।**
- **৫০ টিরও বেশি ক্লাস টেস্ট।**

## মকটেস্টের সূচী :Very Similar Test (VST)

| VST | Date |
|---|---|
| VST-01 | 28.08.16 |
| VST-02 | 11.09.16 |
| VST-03 | 25.09.16 |
| VST-04 | 20.10.16 |
| VST-05 | 23.10.16 |

| VST | Date |
|---|---|
| VST-06 | 06.11.16 |
| VST-07 | 13.11.16 |
| VST-08 | 20.11.16 |
| VST-09 | 27.11.16 |
| VST-10 | 04.12.16 |

| VST | Date |
|---|---|
| VST-11 | 11.12.16 |
| VST-12 | 18.12.16 |
| VST-13 | 25.12.16 |
| VST-14 | 01.01.17 |
| VST-15 | 08.01.17 |

## পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাস টেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন **ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাস করার সুযোগও। কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

প্রকাশিত হল

# WBCS SCANNER

2nd Edition

বইটি সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার

WBCS ২০১৬ প্রিলিম পরীক্ষায় **WBCS SCANNER** থেকে ৬০ টির ও বেশি প্রশ্ন কমন। প্রথম সংস্করনের দ্রুত নিঃশেষের কারণে এবং ছাত্র ছাত্রীদের অনুরোধে সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশ হল —

**বইটির বৈশিষ্ট্য —●৫০০০+ প্রশ্ন-উত্তর।●বিগত ১৮ বছরের ডব্লুবিসিএস প্রিলির প্রশ্নের সমাধান।●বিগত বছরের প্রশ্নের সমস্ত অপশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এসেছে। ●প্রতিটি বছরের প্রশ্নের বিষয় ভিত্তিক এবং টপিকভিত্তিক বিশ্লেষণ।●কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি-ম্যাট। ●কি চাইছে প্রিলিম? ●নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের উপায়। ●মডেল মকটেস্টের সেট। ●মেনস্- এর প্রশ্নপত্রের সমাধান বাংলা এবং ইংরেজি পত্র সহ (২০১৪ এবং ২০১৫)।**

**প্রাপ্তিস্থান: কলেজস্ট্রীট : শপ নং-১০, কলেজ স্কোয়্যার (সাউথ) (14A সূর্যসেন স্ট্রীটের বিপরীতে) কলকাতা-১২ ফোন : 7031842001**

▣ উলুবেড়িয়া-9051392240 ▣ বারাসত -9800946498 ▣ বিরাটি -9674447451 ▣ বহরমপুর -9474582569 ▣ দার্জিলিং-9832041123
▣ প:মেদিনীপুর -9474736230 ▣ আলিপুরদুয়ার-9434412924 (শ্যামলী বুক ডিপো) ▣ কোচবিহার (খোঁজ খবর)-9434191446
▣ দুর্গাপুর -8170828971 ▣ বর্ধমান টাউন -9832164609 ▣ কথা ও কাহিনী, সরস্বতী বুকস্টল (কলেজস্ট্রীট)

## WBCS - 2017 নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে।

# Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata - 700073

© 9674478644
© 9038786000

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: ●Uluberia-9051392240●Barasat-9800946498
●Berhampur-9474582569●Birati-9674447451●Darjeeling-9832041123●Midnapur-9474736230

ফোন করুন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

# ভাবমূর্তি ব্যবস্থাপনা

## পরমাণু শক্তির বিকাশে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ

*বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ি কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অঙ্গারযুক্ত অন্য পদার্থ (জৈবভর-সহ) পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনতে এখন সবাই সহমত। পরমাণু শক্তি আমাদের সামনে হাজির করেছে এক সম্ভবপর বিকল্প। এ এক নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী শক্তির উৎস। এসত্ত্বেও পরমাণু বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কথাবার্তায় উঠে আসে বড়সড় উদ্বেগ-আশঙ্কা। অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে জনসাধারণ ও পরমাণু বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব। এটা ঘোচানোর জন্য বিভিন্ন স্তরে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে কার্যকর আলোচনার পক্ষে এই নিবন্ধে সওয়াল করেছেন—***শ্রীকুমার ব্যানার্জি**

ভারতে পরমাণু শক্তি বিকাশের তিন মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে—দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ক্রমাগত বেড়ে চলা চাহিদা মেটানো, বিশ্বজোড়া জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা কমানো ও দীর্ঘ মেয়াদি শক্তি নিরাপত্তা অর্জন। এটা করতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে সঠিক প্রেক্ষিত জানানো জরুরি। সমাজের এসব অংশের মধ্যে পড়েন নীতি-রচয়িতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদ, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরমাণু ইনস্টলেশন-এর আশপাশের বাসিন্দা, শক্তি পরিকল্পক ও সাধারণ মানুষ। পরমাণু শক্তির বিপক্ষে ব্যক্ত বিভিন্ন উদ্বেগ বা আশঙ্কা নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

### মুখবন্ধ

শক্তির উপায় (অপশন) বিষয়টি বিশ্বের অনেক অনেক দেশে এক উত্তপ্ত আলোচনার প্রসঙ্গ। একদিকে, শক্তি উৎপাদন বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে উন্নয়নশীল জগতের মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা মেটানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে, এর দরুন পরিবেশের উপর চাপ পড়ার ফলে পরিবেশ ও বিশ্বের জলবায়ুর ব্যাপক ও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ি কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব কমানোর জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অঙ্গারযুক্ত অন্য পদার্থ (জৈবভর-সহ) পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে এখন সবাই সহমত।

পরমাণু শক্তি আমাদের সামনে এক সম্ভবপর বিকল্প হাজির করেছে। কেন না :

ক) এ এক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস। এর কার্বন ফুটপ্রিন্ট একেবারে অগৌণ। বেস লোডের প্রয়োজন মেটাতে এটি নিখুঁত লাগসই। সৌজন্যে এর নিরবচ্ছিন্ন, একটানা জোগান।

খ) এর শক্তি ঘনত্ব খুব ঠাসা এবং অল্প পরিমাণ জ্বালানি থেকে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করা যায়। এই অল্প মাত্রার জ্বালানি পরিবহণ করা সহজ। এবং এতে বড় আকারের বিদ্যুৎ কারখানা মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ চালানোর সুবিধা হয়। মহানগর এবং প্রচুর বিদ্যুৎব্যয়ী শিল্পের জন্য নিরবচ্ছিন্ন জোগান দিতে সক্ষম।

গ) জীবাশ্ম জ্বালানির দাম বেড়েই চলায়, পরমাণু বিদ্যুৎ বাণিজ্যিক দিক থেকে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ঘ) গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী দেশগুলি কয়েক দশক ধরে দেখিয়ে দিয়েছে যে পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্যভাবে চালানো যায়।

ঙ) পরমাণু শক্তির সম্ভাবনার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হলে তা আগামী কয়েক শতক ধরে এক নাগাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যেতে পারবে।

এই ইস্তক পড়েই অনেকে ইতি টানবেন। এগোবেন না আর। ভাববেন এই নিবন্ধের ভিত্তি হচ্ছে পরমাণু শক্তির কোনও প্রমোটার বা প্রবক্তার পক্ষপাতদুষ্ট সওয়াল। পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত কথাবার্তায় উঠে আসে বড়সড় সব উদ্বেগ-আশঙ্কা। এর এই ভাবমূর্তি বা এ নিয়ে ধারণা আমি তাই এখানে তুলে ধরছি। প্রায়শই উত্থাপিত প্রশ্ন হল :

ক) পরমাণু ইনস্টলেশন-এর ধারেকাছের পরিবেশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাত্রা কি ঢের বেশি নয়? এর ফলে কি মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয়না? কর্কট রোগ এবং জিনঘটিত অস্বাভাবিকতা কি এর দরুন বাড়ে না?

খ) তেজস্ক্রিয়তা মাত্রা এবং পরিবেশে তাপ বৃদ্ধির ফলে জমির ফলন ও জলাশয়ে মাছচাষের কি ক্ষতি হয় না?

গ) পরমাণু শক্তি কি সত্যি সত্যি দরকার? পরমাণু শক্তি কেন! নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস, বিশেষত সৌর ও বায়ুশক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে কি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় না?

ঘ) পরমাণু বিদ্যুৎ কি খরচে পোষায়, না সরকারি ভরতুকির মাধ্যমে এর দাম প্রতিযোগিতামূলক বলে মনে হয়?

ঙ) বড়সড় এক পরমাণু চুল্লিতে থাকা নিউক্লীয় বিদার্য পদার্থ (ফিসাইল মেটিরিয়াল) থেকে শয়ে শয়ে পরমাণু অস্ত্র বানানো যায়। এহেন মারাত্মক শক্তির উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কী আদতে নিরাপদ?

চ) বন্যা, ভূকম্প ও সুনামির মতো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে পরমাণু চুল্লি কি সুরক্ষিত?

ছ) সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কোথায় গিয়ে ঠেকবে?

জ) বহু বহু বছর ধরে সক্রিয় থাকা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য কিভাবে সামলানো যাবে?

এসব প্রশ্নের বিশদ জবাব এই নিবন্ধের এক্তিয়ারে পড়ে না। তবে সহজ সরল ভাষায় এসব ইস্যু নিয়ে আলোচনার একটা প্রচেষ্টা থাকবে। বিস্তারিত উত্তরের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সের উল্লেখ পাওয়া যাবে।

ইস্যুগুলি টেকনিক্যাল প্রসঙ্গের। তাই ছিমছাম ও টেকনিক্যালি সঠিক ভাষায় এসব ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার দিকে এলেখায় নজর থাকবে। অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে জনসাধারণ ও পরমাণু বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব। এটা ঘোচানোর জন্য বিভিন্ন স্তরে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে কার্যকর আলোচনা দরকার। যেমন—মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম, পণ্ডিত মণ্ডলী, শিল্প-বাণিজ্য জগৎ, স্থানীয় সমাজ এবং নীতি নির্ধারক মহল।

## বিকিরণ আশঙ্কা

আয়নে পরিণত করা বিকিরণ (আয়োনাইজিং রেডিয়েশন) এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। এবং পরিবেশের এই আয়োনাইজিং বিকিরণের মুখে সবসময়ই পড়তে হচ্ছে মানুষ-সহ সব প্রাণীকে। পৃথিবীর ভূত্বক ও মহাকাশের বিকিরণ এই আয়োনাইজিং বিকিরণে মদত জোগায়। অঞ্চল ভেদে এই বিকিরণে ফারাক আছে। এবং এটা নির্ভর করে আমরা যে খাবারদাবার, জল খাই ও যে বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে থাকি তার উপর। বিশ্বে এই পরিবেশের বিকিরণের গড় মাত্রা বছরে ২৪০০ µSv। বেশি পরিমাণ এই বিকিরণের স্থানগুলির মধ্যে চিনের ইয়াংজিয়াং (বছরে ৩৫০০-৫৪০০ µSv, জনসংখ্যা ১ লক্ষ), ব্রাজিলের গুরাপারি (বার্ষিক ৩০০০-৩৫০০০ µSv, জনসংখ্যা ৭০ হাজার) এবং ইরানের রামসর (বছরে ১০০০০-২৬০০০০ µSv, জনসংখ্যা ২ হাজার) অন্যতম। ভারতে কেরলের কোল্লাম জেলার কিছু অঞ্চলে এই মাত্রা বার্ষিক ১০০০-৪৫০০০ µSv। এখানে বাস করে লাখ চারেক মানুষ। কিছু জায়গায় রেডিয়াম-২২৬ এর অবক্ষয় থেকে গঠিত রেডন-২২২ গ্যাস পরিবেশের মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের জন্য দায়ি। কেরলে বায়ুচলাচল ভালো হয় না এমন বদ্ধ ঘরবাড়িতে এই বিকিরণের মাত্রা বছরে ৫০০০০ µSv-ও হতে পারে। এসব তথ্যপরিসংখ্যান থেকে ইঙ্গিত মেলে যে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু এত বেশি বিকিরণ মাত্রা সহ্য করেও টিঁকে থাকতে পারে বৈকি! পরিবেশের উচ্চ বিকিরণের সঙ্গে পরিবেশের কম বিকিরণযুক্ত এলাকায় নবজাতকদের অঙ্গবিকৃতি, ক্রমোজোমজনিত ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ক্যানসারের তুলনামূলক প্রভাব খতিয়ে দেখতে কোল্লামে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দীর্ঘমেয়াদে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই সমীক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখা যাবে ১ ও ২নং সারণিতে। এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে দুই এলাকার নবজাতদের জন্মগত অঙ্গবিকৃতি ও ক্রমোজোমঘটিত ত্রুটির প্রকোপের মধ্যে ফারাক নেই। কেরলের আঞ্চলিক ক্যানসার কেন্দ্রের সমীক্ষা জানিয়েছে স্বাভাবিক এলাকার সঙ্গে তুলনায় পরিবেশের উচ্চ বিকিরণযুক্ত অঞ্চলে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব বেশি নয়। ভারতীয় পরিবেশগত বিকিরণ নজরদারি (ইনডিয়ান এনভায়রনমেন্টাল রেডিয়েশন মনিটরিং) ব্যবস্থা দেশে ৫০০-র বেশি জায়গায় পরিবেশের বিকিরণে নজর রাখে। ১নং রেখাচিত্রে (Fig. 1) বিভিন্ন জায়গায়

**Fig. 1.**
**Background radiation levels at different EIERMON stations. Radiations levels at sites with nuclear facilities and those without any nuclear activities are indicated by ▦ and ▬ bars respectively.**

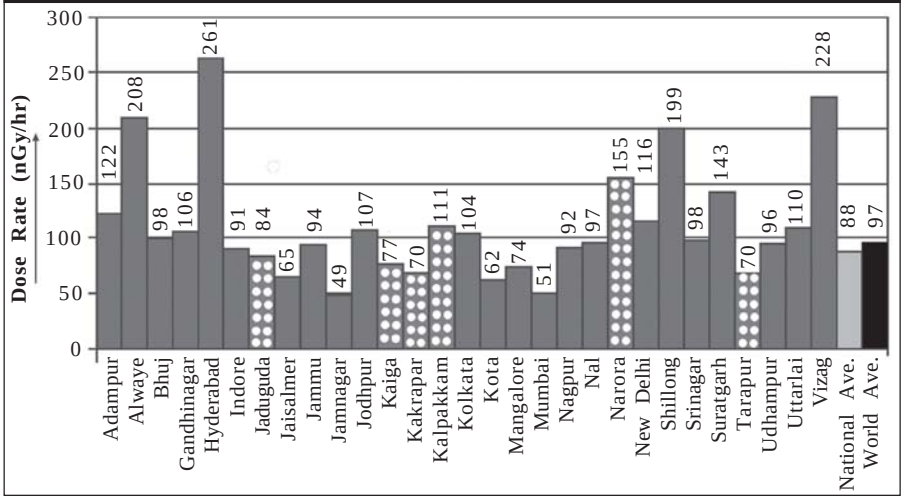

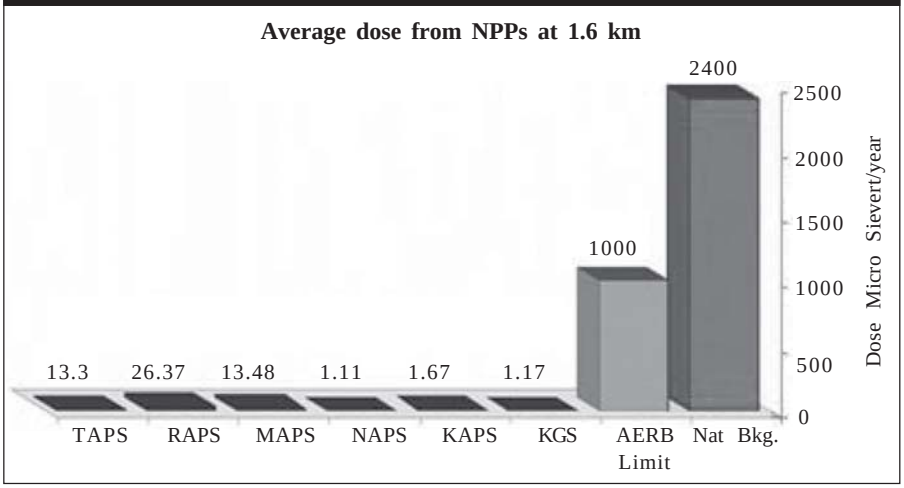




**Fig. 2.**
**Average radiation dose over and above the background at the periphery of the exclusion zones around nuclear power stations at Tarapur (TAPS), Kota, Rajasthan (RAPS), Kalpakkam (MAPS), Narora (NAPS), Kakrapar (KAPS), Kaiga (KGS). AERB permissible limits and national background are also indicated**

এই বিকিরণের মাত্রায় মস্ত ফারাক দেখা যাচ্ছে। ইউরেনিয়াম খনন ও পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানার মতো বড়সড় মাত্রায় শিল্প সংক্রান্ত পরমাণু কার্যাবলীর এলাকার পাশাপাশি পরমাণু বিষয়ে কোনও ধরনের কাজকর্ম চলে না এমন অঞ্চলও ছিল এই সমীক্ষার আওতায়। সমীক্ষায় স্পষ্ট যে পরমাণু ইনস্টলেশন-এর আশপাশে পরিবেশের বিকিরণ মাত্রাছাড়া নয়। এই পয়েন্টকে অন্যভাবেও উপস্থাপন করা যায়। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ থেকে ১.৬ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধ এলাকায় (এক্সক্লুসান জোন) পরিবেশগত বিকিরণ স্তর থেকে কতটা বাড়তি বিকিরণ হয়ে থাকে তার হিসেবে (Fig. 2 দ্রষ্টব্য)। অনুমোদিত বিকিরণ মাত্রার চেয়ে এই অতিরিক্ত বিকিরণ নেহাৎ মামুলি, এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। বিমানযাত্রা, এক্স রে বা ক্যাট-স্ক্যান-এর মাধ্যমে রোগনির্ণায়ক পরীক্ষার মতো সাধারণ কাজকর্মেও মানুষকে বাড়তি বিকিরণের মুখে পড়তে হয়। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাগোয়া এলাকায় সারা জীবন বাস করলেও এর চেয়ে ঢের কম বিকিরণ দেহে ঢোকে (Fig. 3 দ্রষ্টব্য)। এনভায়রনমেন্ট সার্ভে ল্যাবরেটরিজ নিয়মিতভাবে পরমাণু ইনস্টলেশনের ধারেকাছের মানুষের দেহে বিকিরণের মাত্রার দিকে নজর রাখে। এই সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ চালায়, পরমাণু কেন্দ্র পরিচালকদের সঙ্গে এর কোনও গাঁটছড়া নেই। শরীরে ঢোকা বিকিরণ মাত্রার হিসেব পাবার জন্য যে বাতাসে মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস চালায়, দুধ-জল ও অন্যান্য খাদ্য খায়—যাবতীয় উৎসে চলে নজরদারি। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধিমাফিক নিয়মিতভাবে এই বিকিরণ মাত্রার হিসেব রাখা হয়। এসব তথ্যাদি পেশ করা হয় পরমাণু শক্তি নিয়ামক পর্ষদে (অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডে)। সুতরাং, খুব স্পষ্টতই, গড় পরিবেশের বিকিরণ মাত্রার চেয়ে পরমাণু ইনস্টলেশনের আশপাশে একজনের দেহে বেশি বিকিরণ প্রবেশের মাত্রা একেবারে নগন্য। স্বাস্থ্যে বিকিরণের প্রভাব নিয়ে বিশদ জানার জন্য ওয়েড অ্যালিশন (২০০৯)-এর রেডিয়েশন অ্যান্ড রিজন : দ্য ইমপ্যাকট্ অব সায়েন্স অন আ কালচার অব ফিয়ার' বইটির কথা এখানে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

**Table 1**
**Screening of newborns for congenital malformations in high level and normal level natural radiation areas in Kerala**

**Screening of newborns for congenital malformations**
**144,504 newborns (143503 deliveries) screened during Aug 1995–Dec 2011**

| Congenital malformations (birth defects) | Total (n=144504) | % | HLNRA (n=87847) | % | NLNRA (n=56657) | % | RR(95% CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall CA | 3354 | 2.32 | 1919 | 2.18 | 1435 | 2.53 | 0.86* 0.81-0.92 |
| Major CA | 1394 | 0.96 | 856 | 0.97 | 538 | 0.95 | 1.03 0.92-1.14 |
| Stillbirth | 625 | 0.43 | 396 | 0.45 | 229 | 0.40 | 1.12 0.95-1.31 |
| Down Syndrome | 1-6 | 0.07 | 66 | 0.08 | 40 | 0.07 | 1.06 0.72-1.58 |

RR = Relative Risk : Risk in HLNRA relative to that in NLNRA.
*Statistically significant at 5% level.
High Level Natural Radiation Areas (> 1.5 mGy/y)
Normal Level Natural Radiation Areas (≤ 1.5 mGy/y)
CA : Congenital Malformations (birth defects)

**Sources :** Jaikrishan et al. Journal of Community Genetics, Vol 4, Pp 21-31, 2013

**Fig. 3.**
**Standard radiation dose around a nuclear power plant received in a year is compared with those received during several daily life activities.**

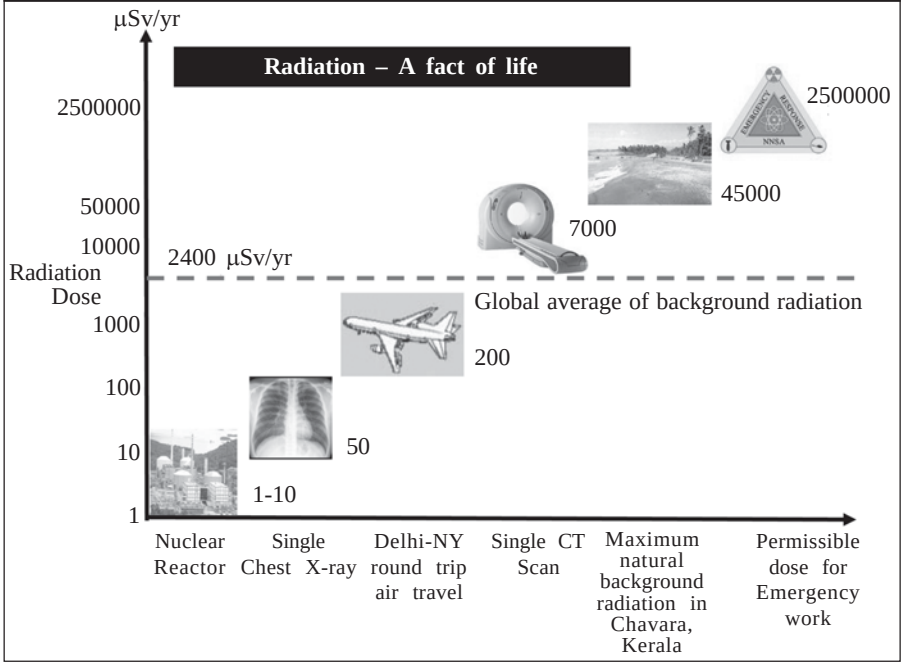


## তাপীয় বাস্তুসংস্থান (থার্মাল ইকোলজি), জীববৈচিত্র্য ও কৃষিতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজকর্মের প্রভাব

কোনও বিদ্যুৎ কারখানায় উৎপন্ন তাপের পুরোটাই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায় না। তাই, একথা অনস্বীকার্য যে, কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে কিছুটা তাপ পরিবেশে ছড়াবে। এই নির্গত তাপ জমবে কাছাকাছির জলাশয় বা কুলিং টাওয়ারের মাধ্যমে আবহমণ্ডলে। জলাশয়ে তাপ ছড়ানো রোখার জন্য কড়া নিয়মকানুন বলবৎ। ১৯৯৮-এ সমুদ্র উষ্ণায়নে বাড়াবাড়ির অভিজ্ঞতায় হুঁশিয়ার হয়ে গোটা বিশ্বেই তাপীয় বর্জ্য নিষ্কাশনের বিধিনিয়ম সংশোধন এবং আরও বেশি কঠোর করা হয়েছে।

জলাশয়ে তাপীয় নির্গমনের জীববিজ্ঞানগত প্রভাবের পরিমাণ সংক্রান্ত হিসেবের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০২ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয় এক সমীক্ষার। এই কাজে হাত মেলায় আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থা। কালপক্কম ও কইগা পরমাণু চুল্লির নিঃসরণের জায়গার কাছাকাছি তাপীয় উদ্গম-এর তথ্য জোগাড় ও বিশ্লেষণ চলে চার বছর ধরে। কালপক্কমে পরিত্যক্ত তাপ নিষ্কাশন করা হয় সমুদ্রে। আর শেষোক্ত স্থানের চুল্লির বর্জ্য তাপ মেশে কালী নদীর পাড়ে কইগার কাদরা বাঁধের মিষ্টি জলে। স্থান ও কালঘটিত পরিবর্তন সামলাতে তিন বছর ধরে বাছাই গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) দ্বারা নির্ধারিত নমুনা নেবার জায়গাগুলি থেকে প্রতি মাসে ইতস্ততভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাপীয় নিঃসরণের উষ্ণতা বণ্টন, নমুনা জোগাড়ের নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে জলের ভৌত-রাসায়নিক (ফিজিকো-কেমিক্যাল) ধর্ম এবং এসব স্থানে প্রাণী-উদ্ভিদের বণ্টন ও সংখ্যা সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য মিলেছে এসব সমীক্ষা মারফত। চতুর্থ বছরে বাছাই করা কিছু প্রজাতি নিয়ে আরও চর্চা চলে ল্যাবরেটরিতে। আপ্তের (২০১৩) করা প্রতিটি রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার থেকে এসব সমীক্ষার বিশদ জানা যাবে।

এটা জোরালভাবে প্রতিপন্ন করা গেছে যে বিদ্যুৎ কারখানা থেকে তাপীয় নিষ্কাশন জলাশয়ে মেশার কালে 'মিক্সিং জোন' তৈরি করে, এর অবস্থান, আকৃতি এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি ($\Delta T$) এমন যে জলাশয়ে বাস্তুসংস্থানের প্রভাব খুব ছোট জায়গায় সীমিত থাকে। গরম ও শীতকালে এই মিক্সিং জোনের মাত্রা এবং অবস্থানে ফারাক অনেকখানি। ঋতুগত এই বড়সড় তফাতের দরুন মাপকাঠিগুলি পুনরুদ্ধার হয়ে বিভিন্ন প্রজাতির পক্ষে ফের বসতি গড়ে তোলার জন্য আরও বেশি অনুকূল অবস্থা তৈরি করে। সর্বোচ্চ উষ্ণতা বৃদ্ধি ($\Delta T$) ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছতে পারে এমন মিক্সিং জোনের টিপিক্যাল সাইজ ৫০০ মিটার × ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর গভীরতা হয় ৩ মিটারের মতো। পরিবেশ ও বন মন্ত্রক মিক্সিং জোনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা বৃদ্ধি ($\Delta T$) ৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে। এবং ব্যাস হবে সর্বাধিক ৫০০ মিটার। এই বাধানিষেধ মেনে চলার ব্যবস্থা নিয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানাগুলি।

তাপীয় ওঠানামায় মাছ বেশ সংবেদনশীল। তাই তাপীয় নিঃসরণ যেখানে মেলে সেই জলের উষ্ণতা তাদের সহনশীলতার মধ্যে থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়। সত্যি বলতে কি, উষ্ণতা অল্প স্বল্প বাড়লে তা মাছের ডিম ফুটে চারা বেরনোয় সাহায্য করে বলে দেখা গেছে। কইগার একটি মাছের হ্যাচারি মাছ উৎপাদন বাড়াতে পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানার নিষ্কাশন খাল এর উষ্ণ জল কাজে লাগায়।

**Table 2**
**Constitutional chromosomal anomalies in high level and normal level natural radiation areas in Kerala**

| | Constitutional chromosomal anomalies | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (n=27,285) | | HLNRA (n=17,294; 63.4%) | | NLNRA (n=9,991,36.6%) | |
| | No. | Freq/1000±SE | No. | Freq/1000±SE | No. | Freq/1000±SE |
| Numerical | 81 | (2.97±0.33) | 50 | (2.89±0.41) | 31 | (3.10±0.56) |
| Structural | 66 | (2.42±0.30) | 38 | (2.20±0.36) | 28 | (2.80±0.53) |
| Total | 147 | (5.39±0.44) | 88 | (5.09±0.54) | 59 | (5.91±0.77) |

The frequencies of numerical and structural anomalies are in agreement with UNSCEAR data.

**Source :** International Journal of Radiation Biology 2013 : 89(4) : 259-267.

**Fig. 4.**
**Nuclear Power plants at Kaiga in thick western ghat forest of Karnataka**

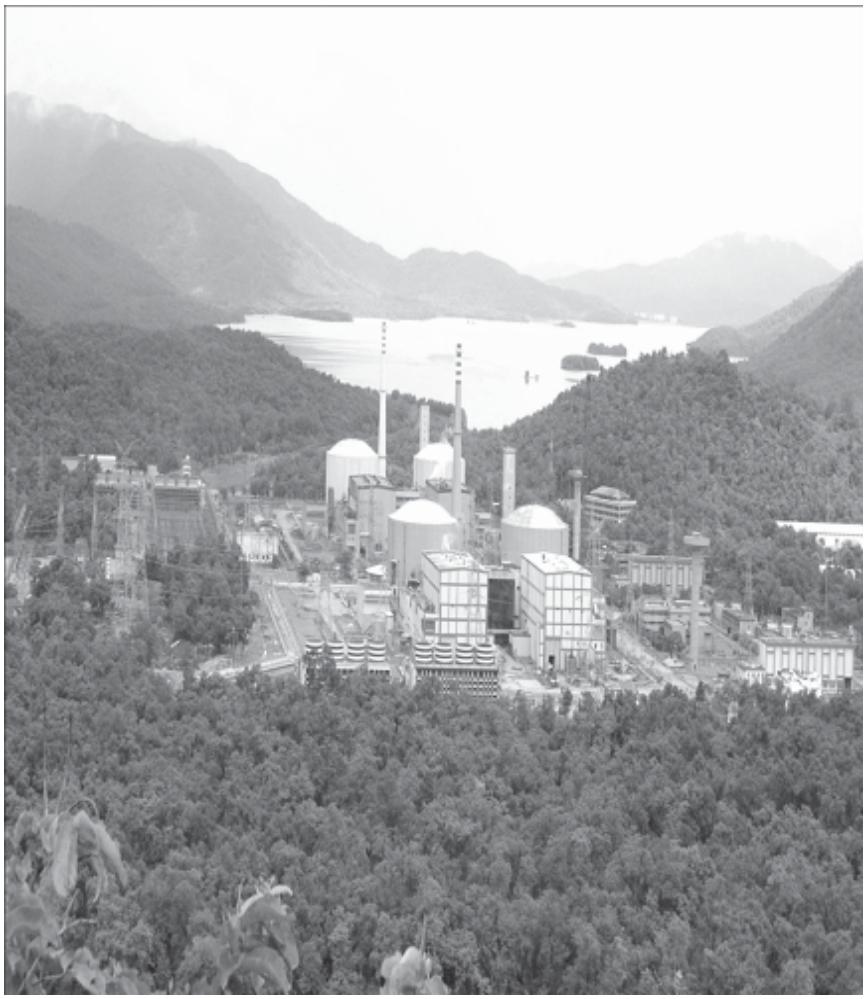

একটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে যে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার আশপাশের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে ফেলে। এটা আগাপাশতলা বেঠিক। বিশ্বের সর্বত্র বহু পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এব্যাপারে পর্যবেক্ষণ থেকে মেলা তথ্যে তা স্পষ্ট। ভারতে এর সেরা নজির কইগা পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঘন অরণ্যে গড়ে তোলা এই কেন্দ্র আশপাশের সঙ্গে খাপ খেয়ে আছে দিব্যি (Fig. 4 দ্রষ্টব্য)। বস্তুত পক্ষে, কারখানার এক্সক্লুশান জোনে চিনেবাদাম, পেয়ারা, সবেদা, আম (আলফানসো, ল্যাংড়া, দশেরা) ও নারকেল চাষ হচ্ছে দেদার (Fig. 5 দ্রষ্টব্য)।

## জ্বালানি মিশ্রণে (এনার্জি মিক্সিং) পরমাণু বিদ্যুতের ভূমিকা

দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ২৭৫ গিগাওয়াট। এর মধ্যে পরমাণুর অংশভাগ ৫.৫ গিগাওয়াট অর্থাৎ, ২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ সালে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের মধ্যে পরমাণুর অবদান ৩৭০০ কোটি ইউনিট। মোট উৎপাদনের ৩.২৫ শতাংশ। সৌজন্যে একযোগে অন্যান্য সব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় পরমাণুর উৎপাদন ক্ষমতার ঢের বেশি সদ্ব্যবহার। ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রায় ১০০০ কিলোওয়াট ঘন্টা। বিশ্বের গড় ৩০০০ কিলোওয়াট ঘন্টার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এবং আমেরিকার এক দশমাংশের চেয়ে কম (Fig. 6 দ্রষ্টব্য)। গড় বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে মানব উন্নয়ন সূচকের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। মানব উন্নয়ন সূচকে ০.৬৫ থেকে ০.৮-এ ওঠার জন্য আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো চাই নিদেন পক্ষে ৪ গুণ। আজও ২৫ শতাংশের মতো মানুষের কাছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ অধরা। আর গ্রাম, আধা শহর এবং মায় শহর এলাকার অনেক জায়গাতেও দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলে লোডশেডিংয়ের দাপট।

কার্বন ডাই অক্সাইড ছড়ানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর নির্ভরতা কমিয়ে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সব ধরনের প্রযুক্তি কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন নিয়ে দ্বিমত নেই। আগামী ২০ বছরে ৮-৯ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বর্তমানের ২৭৫ গিগাওয়াট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৭০০-৮০০ গিগাওয়াট করা এক আবশ্যক পূর্বশর্ত। পাশ্চাত্যের কিছু উন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতির তুলনা করার ক্ষেত্রে একথা মনে রাখা অবশ্যই দরকার। ওই সব দেশে বিদ্যুতের চাহিদা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে (কখনও কখনও চাহিদা কমছেও, সৌজন্যে জনসংখ্যা হ্রাস এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম ও আবাসনের উৎকর্ষসাধন)। দু'দশক পর দেশের পরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের রূপরেখা আঁকা আদৌ দুরূহ নয়। ২০৩৫ সালে ১৪০ কোটি মানুষের জন্য মাথাপিছু ৩০০০ কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুতের (২০১৪-১৫-এর বিশ্ব গড়ের সমান) ব্যবস্থা করতে ৪২০০ টেরাওয়াট ঘন্টা বিদ্যুতের জোগান প্রয়োজন। ২০১৪-১৫-তে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১২০০ টেরাওয়াট ঘন্টা। আগামী দু'দশকের মধ্যে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্যে পৌঁছতে

**Table 3**
**Comparison of nuclear power tariff versus thermal power tarifs for plants located in the nearby areas**

| Nuclear Power Tariff Vs Thermal Power Tarifs (around same location) | | | |
|---|---|---|---|
| **Location** | **Name of power plant** | | **Tariff (Paise/KWh) (As on Mar-2015)** |
| UP | Nuclear : NAPS at Narora | | 249 |
| | Coal Thermal at Dadri | Stage-1: | 478 |
| | | Stage-2: | 546 |
| | CCGT (Nat.Gas) at Dadri | | 502 |
| | CCGT (LNG) at Dadri | | 1230 |
| Rajasthan | Nuclear-RAPS | Units 2 to 4: | 278 |
| | | Units 5 & 6: | 344 |
| | CCGT (Nat.Gas)-Anta | | 430 |
| | CCGT (LNG) - Anta | | 1040 |
| | Kota Thermal Power Station | | 381 (for 2014-15) |
| Gujarat | Nuclear - KAPS | | 237 |
| | Coal Thermal Ukal | Units 1 to 5 | 238 |
| | | Unit 6 | 324 |

**Sources :** CERC, RERC, GERC & NPCIL

**Fig. 5.**
**Agriculture around Nuclear Power Plants**

হলে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকাংশটা আসা দরকার তাপবিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ গিগাওয়াট এবং সৌর ও বায়ু শক্তি থেকে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ গিগাওয়াটের বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটা দরকার। সৌর ও বায়ু শক্তির উৎপাদনে ওঠাপড়া থাকায় উৎপাদন ক্ষমতার ২০-২৫ শতাংশের বেশি সদ্ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই দু'শক্তির বেলায় কোনও নির্দিষ্ট উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে, সেই লক্ষ্যের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার। এই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে Fig. 7-এ। সম্প্রতি আমাদের দেশে নবীকরণযোগ্য শক্তি, মূলত সৌর ও বায়ুর উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, পরমাণু শক্তি উৎপাদনে সীমিত প্রসার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে তাদের অবদান দেখানো হয়েছে এই রেখাচিত্রটিতে (Fig. 7)। পরমাণুর তুলনায় প্রায় ৭ গুণ উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৌর ও বায়ু শক্তির উৎপাদন পরমাণুর দু'গুণের চেয়ে একটু কম। বায়ু ও সৌর শক্তির উৎস স্বভাবত বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, এক জায়গায় বেশি উৎপাদন অসম্ভব এবং সেই উৎপাদনও নিরবচ্ছিন্ন নয়। পক্ষান্তরে পরমাণু বিদ্যুৎ এক জায়গায় সংহত ভাবে উৎপাদন করা যায় এবং উৎপাদন চলে একটানা। ১০ গিগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য সৌর ও বায়ু শক্তি কেন্দ্রের জমি লাগবে যথাক্রমে ৪০০ এবং ৫০০০ বর্গকিলোমিটার। সেখানে একই ক্ষমতার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য দরকার মাত্র কয়েক বর্গ কিলোমিটার (অবশ্য এক্সক্লুসান জোনকে না ধরে)।

সৌর ও বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করা যায়। এই দুই শক্তি একত্রে ৫৭০ টেরাওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ জোগাতে পারে। সেখানে পরমাণু বিদ্যুৎ জোগান (৮০ শতাংশের বেশি ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের সুবাদে) অতিক্রম করে যাবে ৪২০ টেরাওয়াট ঘন্টা। এসবের সঙ্গে জলবিদ্যুতের পরিকল্পিত বৃদ্ধি জুড়লে দেশে অ-কার্বন বিদ্যুৎ উৎপাদন পৌঁছতে পারে প্রায় ৩৫ শতাংশে।

**Table 4**
**Investment required to generate 1 MWh (1000 KWh) electricity from nuclear vis-à-vis wind and solar power**

| Investment required to generate 1 MWh (1000 KWh) Nuclear vis-à-vis wind and solar power | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | **Nuclear PHWR** | **Nuclear LWR** | **Wind** | **Solar PV** |
| Capacity Factor | 80% | 85% | 20%-25% | 19% |
| Capacity to be Installed to generate hourly 1 MWh (MW) | 1.25 | 1.1-1.25 | 4-5 | 5.26 |
| Completion Cost per MW (Rs. Crore) | 14.71 | 20 | 5.75 | 5 |
| Investment Required (Rs. Crore) | 18.75 | 20-25 | 23-29 | 26 |
| Additional Investment required to generate power when source not available (diesel @ Rs. 4 crore/MW) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total Investment Required (Rs. Crore) | 18.75 | 20-25 | 27-33 | 30 |

• PHWRs capital cost based on Haryans 1&2 (under approval) estimated completion cost & LWR based on KK 3&4 sanctioned completion cost
• Capacity Factor & Capital costs of Wind & Solar PV based on CERC Order dated 27.03.2012 on Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources

**Fig. 6.**
**Comparison of Per capital electricity consumption in some countries and the world average.**

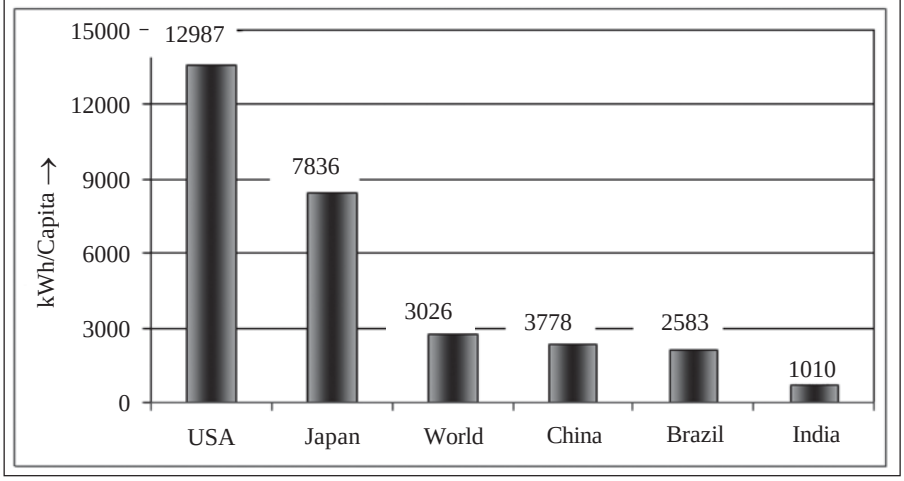


ভারত ক্রমশ এক বড় কয়লা আমদানিকারী দেশ হয়ে উঠছে। এদিকটি সংবাদ মাধ্যমের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি জোগাতে আমরা আরও বেশি করে আমদানির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ব। এর বড় কারণ, দেশে উৎপাদিত কয়লা নিকৃষ্ট মানের, জোগান মেলায় অনিশ্চয়তা এবং বৃহদাকার খনি থেকে উত্তোলন ও পরিবহনে বাধাবিঘ্ন। দেশি ও বিদেশি কয়লা খনি এবং বন্দর থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার জন্য এলাহি পরিবহনের ব্যবস্থা করা বিস্তর ঝুটঝামেলার বিষয়। তাপবিদ্যুতের দামের একটা মোটা অংশ চলে যায় জ্বালানি বাবদ খরচ মেটাতে। কয়লা আমদানির উপর নির্ভরতা বাড়লে দেশে বিদ্যুতের দাম বাড়বে চড়চড় করে। পরমাণু বিদ্যুতে জ্বালানি খরচ মাত্র ১৫ শতাংশের কম হওয়ায় ভবিষ্যতে বিদ্যুতের দাম স্থিতিশীল রাখতে তা সাহায্য করবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যয়ের তুলনা করতে একই সময় এবং দেশের মোটামুটি একই অঞ্চলে অবস্থিত কারখানার

বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হিসেব করা দরকার। Table 3-তে তাপ ও পরমাণু বিদ্যুতের এহেন এক তুলনা টেনে দেখানো হয়েছে যে খরচের দিক থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রতিযোগিতাক্ষম। পরমাণু বিদ্যুতের জন্য কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সরকারি ভরতুকি মেলে না। পরমাণুর তুলনায় সৌর এবং বায়ু শক্তির মেগাওয়াট পিছু মূলধনী ব্যয় অবশ্য কম। এই সুবিধা অবশ্য বরবাদ হয়ে যায় সৌর ও বায়ু শক্তির উৎপাদন ক্ষমতার কম সদ্ব্যবহারের দরুন (Table 4 দ্রষ্টব্য)।

## পরমাণু শক্তির সুরক্ষা

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কোয়াশ কোর্ট-এ ১৯৪২-এর ২ ডিসেম্বর পরমাণু যুগের হাতেখড়ি। শিকাগো পাইল ওয়ান দেখায় যে পরমাণু বিভাজনের চেইন রিয়্যাকশন সেলফ-সাসটেনিং হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে শক্তি টেনে নেওয়া যায়। ষাট থেকে আশি দশকে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। ফ্রান্স তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৮০ শতাংশ পরমাণু শক্তি থেকে মেটানোর কর্মযজ্ঞ রূপায়ণে হাত দেয়। ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলে আমেরিকায়। ১৯৮৪ নাগাদ বিশ্বে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায় একশো গিগাওয়াট। ১৯৭৯-তে থ্রি মাইল দ্বীপ এবং ১৯৮৬-তে চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর পরমাণু সুরক্ষা নিয়ে মানুষের মনে গুরুতর সন্দেহ জাগে এবং পরমাণু শক্তিতে তাদের আস্থা টাল খায়। সব মিলিয়ে পরমাণু শক্তির বিকাশে পড়ে ভাঁটা। এবং কেবলমাত্র শক্তির প্রবল চাহিদাসম্পন্ন দেশগুলিতে আরও ক্ষমতা বাড়ানোর কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

নব্বই দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকে সরা পৃথিবীতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাফল্য ছিলচোখ ধাঁধানো (প্রায় সাড়ে তিনশো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরাপদে কাজকর্ম চালানো ও ক্ষমতার ৮০ শতাংশ সদ্ব্যবহার)। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্গীরণ এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে তার কুফল নিয়ে আশঙ্কা বাড়ার ফলে পরমাণু বিদ্যুতে আগ্রহ ফিরে আসে। পরমাণু নবজাগরণ বা অগ্রগতির যুগ সমাসন্ন, এহেন মুহূর্তে ২০১১-র ১১ মার্চ সুনামি আছড়ে

**Fig. 7.**
**Comparison of installed capacity in MWe and electricity Produced in KWh for renewable and nuclear power**

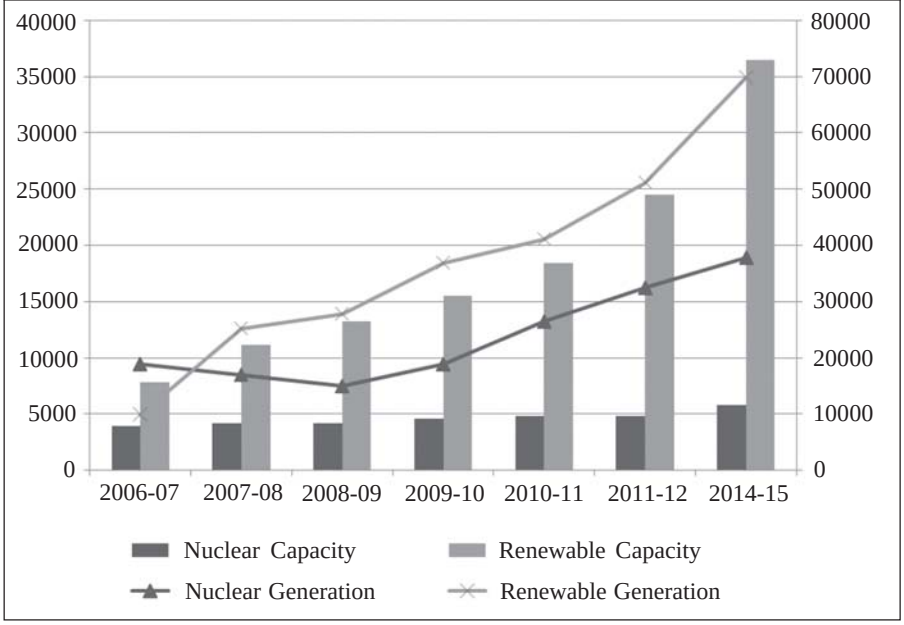


**Fig. 8.**
**Projected requirement of Import of non-coaking coal in India.**

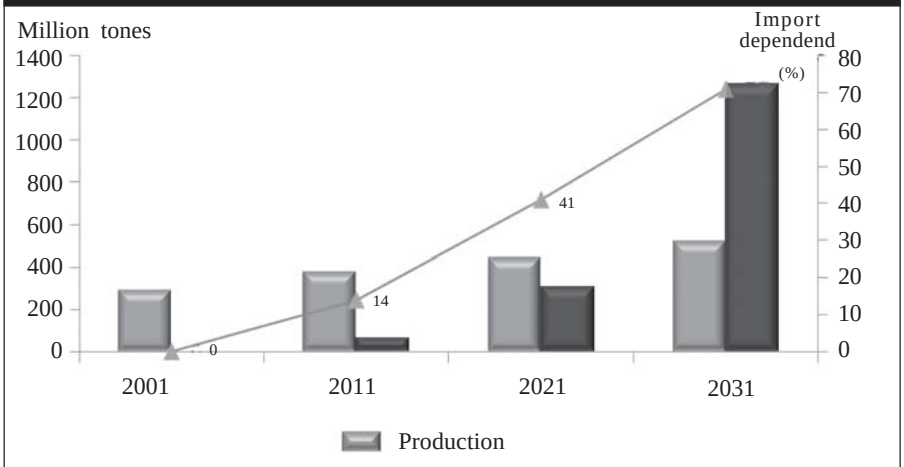


পড়লো জাপানের পূর্ব উপকূলে। এলাকার এগারোটি পরমাণু চুল্লি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডিজাইন বা পরিকল্পনামাফিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের যাবতীয় জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন এবং কারখানার বন্যা প্রতিরোধী বাঁধ সুনামির ১৪ মিটার উঁচু জলোচ্ছাসে চাপা পড়ে। চুল্লির ডিকে হিট রিমুভাল সিস্টেম-এর কাজকর্ম যায় বন্ধ হয়ে। এর দরুন তিনটি চুল্লির দারুণ ক্ষতি হয়। পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয় দূষণ। এই দুর্ঘটনায় কেউ প্রাণ না হারালেও লক্ষ লক্ষ নাগরিককে সবিয়ে নিয়ে যেতে হয় নিরাপদ আশ্রয়ে। এত মানুষের দুর্দশা-ভোগান্তির তো একশেষ হয়ই। সেইসঙ্গে পরমাণু কেন্দ্রের চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা পড়ে দূষণের কবলে।

ফুকুশিমা দুর্ঘটনার দরুন অনেক দেশে পরমাণু শক্তির বিকাশ সাময়িকভাবে থমকে যায়। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং ইটালির মতো কয়েকটি দেশ তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় পরমাণুর অংশভাক ক্রমশ কমিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করে। এবং একটা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পরমাণু শক্তি উৎপাদন পুরোপুরি গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত

জানিয়ে দেয়। এই চটজলদি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বলবৎ ছিল অবশ্য মাত্র অল্প সময়। পরমাণু শক্তি বর্জনের পরিকল্পনাকারী দেশগুলিতে ভবিষ্যতে বাড়তি বিদ্যুতের দরকার নেই। অথবা পড়শি দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সুযোগ আছে। পরমাণু বিদ্যুৎ মেলার সুবাদে এসব প্রতিবেশী দেশে বিদ্যুৎ বাড়তি বা উদ্বৃত্ত হয়। জার্মানির মতো কিছু দেশ তাই এ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। বেড়ে চলা অর্থনীতির দেশগুলো, বিশেষত ভারত ও চিনে কার্বন নিঃসরণ মামুলি এহেন প্রাথমিক শক্তির উপর নির্ভরতা খুব আবশ্যক। চিন এব্যাপারে সৌর, বায়ু এবং পরমাণু শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বাড়িয়ে সঠিক দিশায় পদক্ষেপ করেছে। ২০২০ সাল নাগাদ সেদেশে ৫৮ MWe ক্ষমতার পরমাণু চুল্লি চালু হয়ে যাবে এবং এখন ৩৮ MWe ক্ষমতার চুল্লি বসানোর কাজ চলছে।

এখন পৃথিবীতে ৪৪২-টি পরমাণু চুল্লি থেকে উৎপাদিত হয় মোট বিদ্যুতের ১১ শতাংশ। বিশ্বে সার্বিকভাবে ১৬৫০০ চুল্লি-বর্ষের (রিঅ্যাকটর-ইয়ার) অভিজ্ঞতা আছে। এর মধ্যে ভারতের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩২ চুল্লি-বর্ষ। উৎপাদন ক্ষমতার উচ্চ সদ্ব্যবহার-সহ এই নিরাপদ কাজকর্ম চালানোর রেকর্ড পরমাণু বিভাজন থেকে নিয়ন্ত্রিত শক্তি নির্গমন প্রযুক্তির সামর্থ্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনটি বড় দুর্ঘটনাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল এবং এহেন দুর্বিপাক কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমানে নিয়ামক ব্যবস্থাদি বেশ কড়া। তিনটি পরমাণু দুর্ঘটনার প্রভাব নিয়ে কখনোসখনো রঙ চড়ানো হয়েছে। বিভ্রান্তি দূর করে সুস্পষ্ট তথ্য তুলে ধরার জন্য Fig. 9-এ শক্তি উৎপাদনের কাজে বিশ্বে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা বিপর্যয়ের পরিসংখ্যানের তুলনা আছে।

স্থান বাছাই, নির্মাণ, কাজকর্ম এবং বন্ধ করে দেওয়া সব ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তিতে সুরক্ষার দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ডিজাইন ব্যর্থতা-মুক্ত এবং শক্তপোক্ত করার জন্য বেশ কয়েক পরত বাড়তি ব্যবস্থা থাকে। স্থান পছন্দ ও ডিজাইন পর্যায় থেকে ভূকম্প, বন্যা ও সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের দিকে উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়। এহেন প্রাকৃতিক ঘটনা সহ্য করার জন্য কেন্দ্র গড়া হয় মজবুত করে। আমাদের নিজেদের

**Fig. 9.**
**Fatalities from accidents from electricity generating units-normalized per TWh of electricity.**

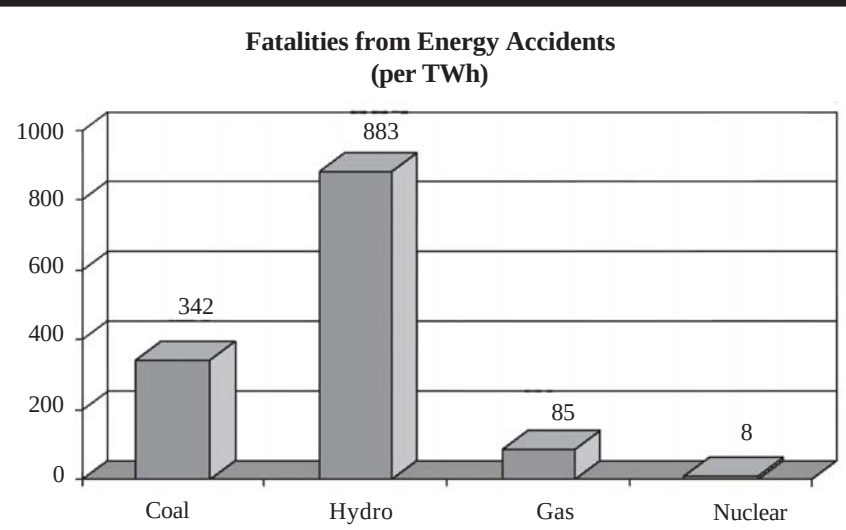


**Fig. 10.**
**Once through and closed nuclear fuel cycle.**

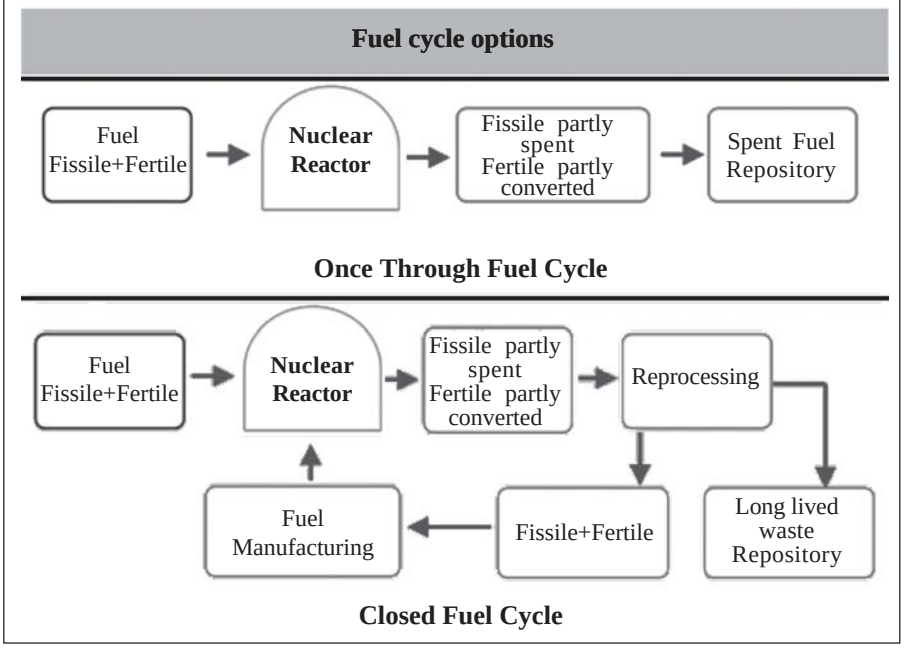


অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণ মেলে এর সত্যতার। সুনামির সময় কলপাক্কমে চুল্লিগুলি নিরাপদে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভুজের জোরালো ভূকম্প সামলে নেয় কাকরাপারের চুল্লিগুলি। নির্মাণ ও কেন্দ্রের কাজকর্ম চলার সময় সর্বোচ্চ গুণমান ও সুরক্ষার স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা হয়। পরমাণু কারখানার জীবৎকাল ও বন্ধ করে দেবার সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে।

## সুদীর্ঘ পরমায়ু সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘ আয়ুষ্কালের তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের নিরাপদ সাফাই-এর বন্দোবস্ত করা পরমাণু শিল্পে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। ব্যবহৃত ও ফাঁকা পরমাণু জ্বালানিতে (স্পেন্ট নিউক্লিয়ার ফুয়েল) কিছু রূপান্তরিত (ট্রান্সমিউটেড) রেডিও আইসোটোপ (প্রধানত ট্রান্স-ইউরেনিক) তেজস্ক্রিয়তা টিকে থাকে এক

লক্ষ বছর বা তার বেশি সময় ধরে। এধরনের বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিরাপদে জমা রাখা সত্যিই এক বড় চ্যালেঞ্জ। বিকল্প উপায় হচ্ছে ব্যবহৃত ও ফুরিয়ে যাওয়া জ্বালানির অবশেষ পৃথক করে দ্রুত পরমাণু প্রতিক্রিয়ার চুল্লিতে (ফাস্ট রিফ্যাকটর) পুড়িয়ে ফেলা অথবা অ্যাকসিলারেটর চালিত ব্যবস্থায় উচ্চ শক্তির চার্জযুক্ত কণা (হাই এনার্জি চার্জড পার্টিকল) দিয়ে সেগুলি বিকিরণমুক্ত (ইরেডিয়েট) করা। ক্লোজড নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকল অবলম্বন করলে দরকারি বিভাজনযোগ্য পদার্থ ও দীর্ঘজীবী গৌণ অ্যাক্টিনাইডগুলি পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত ও ফুরিয়ে যাওয়া পরমাণু জ্বালানির পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন। ভারত ক্লোজড ফুয়েল সাইকল গ্রহণ করেছে (Fig. 10 দ্রষ্টব্য) এবং গৌণ অ্যাক্টিনাইডগুলি পৃথক করা সহ পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি দেশেই বানিয়েছে। তাই পরমাণু বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানির এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র নিরাপদে কয়েকশ বছর জমা রাখার বন্দোবস্ত দরকার (Fig. 11 দ্রষ্টব্য)।

**Fig. 11.**
**Decay of Radiotoxicity inventory of nuclear waste with time. Total spent fuel will take 100000 years to decay to the level of natural uranium ore, while waste after removing actinides will take about 300 years to come to the same level.**

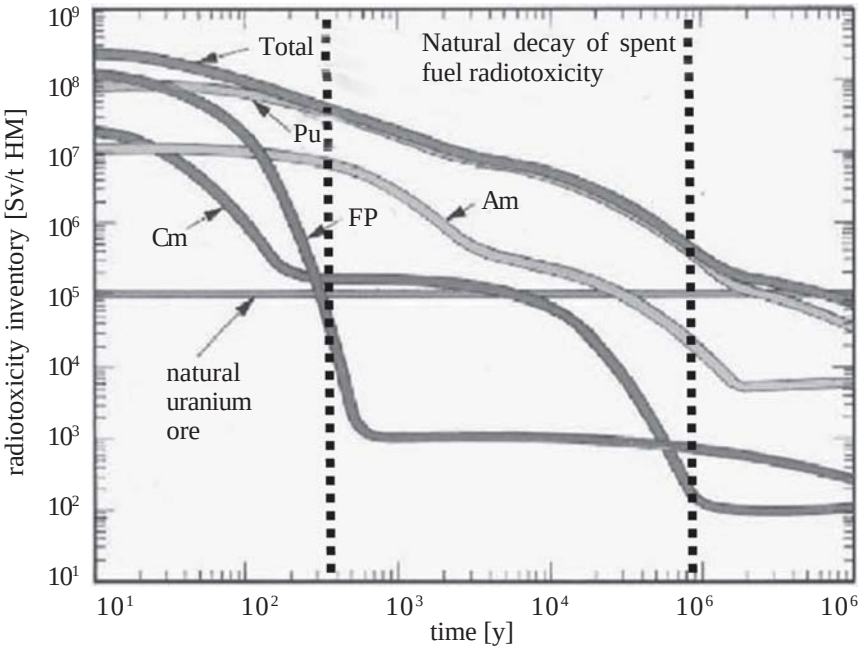


**With early introduction of fast reactors using (U+Pu+Am) based fuel, long term raditoxicity of nuclear waste will be reduced.**

## দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নিরাপত্তা

যেকোনও দেশের শক্তি নীতি নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রাপ্তব্য বা আয়ত্তাধীন সম্পদ। এই নীতি দীর্ঘ মেয়াদে শক্তি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। ভারত অকৃপণ সূর্যকিরণ ও প্রায় অনিঃশেষযোগ্য থোরিয়াম সম্পদের কৃপাধন্য। প্রকৃতিদত্ত এই দুই উপহার কুশলতার সঙ্গে কাজে লাগানোর উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিতব্য। একটা প্রশ্ন হরবখত উঠে থাকে যে এযাবৎ পৃথিবীর কোথাও থোরিয়াম থেকে শক্তি উৎপাদন করা হয় না কেন। জবাবে বলতে হয়, থোরিয়ামে নেই কোনও বিভাজনযোগ্য আইসোটোপ। নিউট্রন কণা আহরণ করে বিভাজনযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষমতাসম্পন্ন থোরিয়ামকে ইউরেনিয়াম-২৩৩, এই বিদার্থ পদার্থে রূপান্তর করা দরকার। সেই পঞ্চাশের দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে বিভাজনযোগ্য পদার্থের মজুতও বাড়ানোর জন্য সুপরিচিত তিন স্তরীয় পরমাণু কর্মসূচি ছকা হয়। তৃতীয় স্তরে থোরিয়াম থেকে বৃহদাকারে শক্তি উৎপাদনে প্রবেশ করার জন্য এটা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক পরমাণু সহযোগিতায় ভারতের অধুনা অন্তর্ভুক্তির দরুন উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত প্রসারের পথ গেছে খুলে। এবং এর ফলে বিভাজনযোগ্য পদার্থ আরও মজুত করার কাজ এগোবে দ্রুত। ইতোমধ্যে থোরিয়াম কাজে লাগানোর উপযুক্ত বেশ কিছু প্রযুক্তির বিকল্প হয়েছে। সৌর এবং থোরিয়াম শক্তির উন্নয়ন আমাদের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে যে বেশ কয়েক শতক যাবৎ শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। পরিবেশের উপর কোনও চাপ না দিয়েই এটা করা যাবে। সুতরাং দেশের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অর্জন করা সম্ভব হবে। ❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক মুম্বই-এর ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের হোমি ভাবা চেয়ার অধ্যাপক। আচার্য, কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর; আচার্য, হোমি ভাবা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, মুম্বই; খড়গপুর আই আই টি বোর্ড অফ ডিরেকটরস-এর চেয়ারম্যান। তিনি পরমাণু শক্তি আয়োগের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি দপ্তরের সচিব ছিলেন। ছিলেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভাটনগর পুরস্কার প্রাপক। পেয়েছেন হামবোল্ট গবেষণা পুরস্কার, ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার সোসাইটি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, বিশিষ্ট মেটিরিয়ালস সায়েনটিস্ট সম্মান, জাতীয় ধাতুবিদ পুরস্কার এবং আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মেটিরিয়ালস থেকে ডাব্লিউ জে ক্রোল পদক। এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট। এর মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়গপুর আই আই টি। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্সেস অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, ইন্ডিয়া এবং দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর ফেলো। ইমেল : sbanerjee@barc.gov.in, sbanerjee1946@gmail.com)

# ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রেক্সিট-এর ওপারে

*ব্রেক্সিট নিয়ে গত ২৩ জুনের গণভোটের ফলাফল ব্রিটিশ জনজীবনে এক বড়সড় অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। কারণটা মূলত অর্থনৈতিক। গণভোটের পরের দিনই বিশ্ববাজার থেকে ২ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের পুঁজি মুছে যায় এবং পাউন্ড গত তিন দশকের সব থেকে কম মূল্যে নেমে আসে। গণভোটের আগে চলতে থাকা প্রচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রেক্সিটের পক্ষপাতী এবং বিরোধীরা নিজেদের অবস্থানের স্বপক্ষে যেসব বক্তব্য পেশ করে আসছিলেন তা ছিল বহুলাংশেই স্রেফ অনুমান নির্ভর। অর্থাৎ, তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যতখানি ছিল অর্থনৈতিক বাস্তবতার থেকে তা ছিল কয়েক যোজন দূরে। তাই ইদানীংকালে ইউরোপীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের বাড়বাড়ন্তে সূত্রে গণভোটে জয়লাভের পরও বেক্সিটের সমর্থক রাজনীতিবিদেরাও এমনই EU-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলছেন না। লন্ডনের এই "ধীরে চলো" নীতি বিশ্ব বাজারে ঘোর অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে, যা ব্রিটেন বা ইউরোপ কারও পক্ষেই ভালো সাব্যস্ত হচ্ছে না। লিখেছেন—***ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায়***

২০১৬ সালের ২৩ জুন তারিখটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union বা EU)-এর বিবর্তনের ইতিহাসে এক নতুন মাইল ফলক হিসাবে সাব্যস্ত হতে চলেছে। চার দশকের থেকেও বেশি সময় সদস্য থাকা যুক্তরাজ্য (United Kingdom) ওই দিন একটি গণভোটে EU থেকে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যা চলতি ভাষায় 'ব্রেক্সিট' বলা হচ্ছে। আইনের চোখে এই গণভোটের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াটা ব্রিটিশ সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক না হলেও, EU-তে থেকে যাওয়ার পক্ষপাতী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার অঙ্গীকার জানিয়ে পরিণামের দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেন। গণভোটের ফলাফল ব্রিটিশ জন-জীবনে একটি বড়সড় অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। কারণ, ক্যামেরনের উত্তরসূরি টেরেসা মে ব্রেক্সিট-এর সমর্থন করেননি এবং নতুন ক্যাবিনেটে বরিস জনসনের মতো ব্রেক্সিট-এর বরিষ্ঠ সমর্থকরা ক্ষমতার অলিন্দে উপস্থিত থাকলেও ব্রিটেন এখনই EU থেকে বেরিয়ে আসার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না—কারণ সেই প্রক্রিয়া ব্রিটিশ অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গে ইউরোপের রাজধানীগুলোতেও তেমন উত্তেজনা চোখে পড়ছে না, কারণ ব্রিটেন EU ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ইউরোপের ওপরে কী প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়েও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

গণভোটের আগে চলতে থাকা প্রচারে দেখা গিয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রেক্সিটের পক্ষপাতী এবং বিরোধীরা তাদের নিজেদের অবস্থানের স্বপক্ষে যেসব বক্তব্য রাখছিল তা বহুলাংশেই অনুমান নির্ভর ছিল। নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে এমন কথা এক্ষেত্রে কমই রয়েছে। এই অল্প কিছু নিশ্চয়তার মধ্যে অন্যতম হল, ব্রিটেনকে ২০১০ সালের লিসবন চুক্তির পঞ্চাশতম অনুচ্ছেদ অনুসারে EU থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তের সরকারি ঘোষণার দু' বছরের মধ্যে বাইরে যাবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ, গত চল্লিশ বছর ধরে ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ক চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয়েছে তার কোনটা বলবৎ থাকবে, কোনটা সম্পূর্ণত বাতিল হবে, কোনটা আংশিকভাবে প্রযুক্ত হবে—এই সব বিষয়ই এই দু' বছরের মধ্যে নতুন চুক্তি এবং সমঝোতার মাধ্যমে স্থির করে ফেলতে হবে।

EU এবং ব্রিটেন, উভয়ের ক্ষেত্রেই এই আসন্ন সমঝোতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটেনের মোট রপ্তানির প্রায় ৪৮ শতাংশ পণ্যসামগ্রী ইউরোপের নিঃশুল্ক বাজারে বিক্রি হয় (২০১৫ সালে যার মূল্য ছিল ২১০ বিলিয়ন ডলার)। শতাংশের বিচারে ইউরোপের চোখে ব্রিটেনের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম—২০১৫ সালে EU-র মোট রপ্তানির মাত্র ৬ শতাংশ ব্রিটেনে বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে সংখ্যাটি ফেলনা নয়—৩৫০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। ব্রিটেন ইউরোপ ছেড়ে বেরিয়ে গেলে এই পুরো বাণিজ্যিক লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়, তবে সমগ্র ইউরোপের সর্বত্র নিঃশুল্ক বাজারের সুবিধা থেকে ব্রিটেন যদি পুরোপুরি, খানিকটা বা ক্ষেত্রবিশেষে বঞ্চিত হয়, তাহলেও তা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। EU-এর মূল গুরুত্বই হল এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি অন্যান্য সদস্য দেশগুলির সঙ্গে শুল্ক না দিয়ে পণ্যসামগ্রীর আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে; কিন্তু যারা সদস্য নয় এমন দেশগুলির ক্ষেত্রে সকল সদস্য দেশই অনুরূপ শিল্প নীতি নেবে। EU-এর সদস্য না হয়েও শর্তসাপেক্ষে নিঃশুল্ক বাজারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তার জন্য EU-এর সঙ্গে পৃথক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। যদি ব্রিটেন নিঃশুল্ক বাজারের সুবিধা থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়, তাহলে বিশ্বের যে কোনও দেশের পণ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্যকে মোকাবিলা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ব্রিটেন তার ওপরে চাপানো চড়া শুল্কের কারণে ইউরোপীয় বাজারের একটি বড় অংশ হারাতে বাধ্য। যদি এমন সমঝোতা হয় যে ব্রিটেন বিশেষ বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে নিঃশুল্ক বাজারের সুবিধা পাবে, কিন্তু

অন্য কিছু ক্ষেত্রে নয়, সেক্ষেত্রে যেগুলিতে ব্রিটেন ওই সুবিধা পাবে, সেখানে তাকে বিশ্বের অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে না, কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে ব্রিটেন অন্যান্য অ-সদস্য দেশের সমকক্ষ বলে গণ্য হবে এবং চড়া শুল্ক দিতে বাধ্য থাকবে। তাই কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন গণভোটে জয়লাভ করার পরেও ব্রেক্সিটের সমর্থক রাজনীতিবিদেরা এখনই EU-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলছেন না। এমনকি ব্রেক্সিটের প্রচারের অন্যতম মুখ এবং বর্তমান ক্যাবিনেটের বিদেশমন্ত্রী খোদ বরিস জনসনও নয়।

✶ ✶ ✶ ✶

সমস্যার কথা হল যে, একদিকে গণভোটে ব্রিটেনের ইউরোপ ছাড়ার সিদ্ধান্ত এবং ফলাফল প্রকাশের পরে লিসবন চুক্তির ৫০তম অনুচ্ছেদ প্রয়োগের ব্যাপারে লন্ডনের এই "ধীরে চলো" নীতি বিশ্ব বাজারে অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে, যা ব্রিটেন বা ইউরোপ কারও পক্ষেই ভালো সাব্যস্ত হচ্ছে না। ২৪ জুন, অর্থাৎ গণভোটের পরের দিনই, বিশ্ব বাজার থেকে ২ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের পুঁজি মুছে যায় এবং পাউন্ড গত তিন দশকের সব থেকে কম মূল্যে নেমে আসে। অন্যদিকে, একাধিক ব্যবসায়িক সংস্থা, যেমন, ভোডাফোন, ইতোমধ্যেই ইউরোপের নিঃশুল্ক বাজারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের প্রধান দপ্তর ইউরোপে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সিমেন্স তাদের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী পাঁচ বছরে ব্রিটেন ন্যূনতম ১০০,০০০ চাকরি হারাতে চলেছে।

ইউরোপের রাজধানীগুলিতেও স্বস্তি নেই। ব্রিটেন ছিল জার্মানির পরেই EU-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। EU-এর মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১৯ শতাংশ ছিল ব্রিটেনের অবদান। ১৯৭০-এর দশক থেকেই একদা বিশ্বের অন্যতম পুঁজির বাজার এবং ব্যাংকিং পরিষেবার ভরকেন্দ্র লন্ডন হয়ে উঠেছিল সমগ্র EU-এর ব্যাংকিং ব্যবসার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র; যদিও ব্রিটেন EU-এর অভিন্ন মুদ্রা, ইউরো কখনও গ্রহণ করেনি। ব্রেক্সিটের পরে এই আর্থিক ভরকেন্দ্র এবারে ইউরোপীয় কোনও দেশে স্থানান্তরিত হলে সেখানে লন্ডনের ব্যাংকিং পরিষেবার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুফল আর পাওয়া যাবে না বলে ইউরোপীয় পুঁজির বাজারে কিছুটা টালমাটাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, অখণ্ড ইউরোপীয় বাজারে ব্যবসার সুবাদে লন্ডনের আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্র ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে, ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রিটিশ ব্যাংকিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বহু সংস্থাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই ইতোমধ্যেই বহু আর্থিক সংস্থা তাদের সদর দপ্তর লন্ডন থেকে সরিয়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সারা দুনিয়া জুড়েই যে অর্থনৈতিক সমস্যা চলেছে এবং ইউরোপেই গ্রিসের চলতে থাকা আর্থিক সংকট, তথা অদূর ভবিষ্যতে ইতালিতে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আসন্ন সংকট—এই সবের মধ্যে আবার ব্রেক্সিট EU-এর পক্ষে এক বিশাল ধাক্কা।

আরেকটি জটিল বিষয় হল প্রবাসী ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় নাগরিকদের সমস্যা। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত শেঙ্গেন (Schengen) চুক্তি অনুসারে, EU-এর সদস্য দেশগুলি তাদের মধ্যে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলত, EU-এর নাগরিকেরা অবাধে EU-এর সর্বত্র অনায়াসেই যেতে পারেন এবং EU-এর বাইরে থেকে আসা যে কোনও ব্যক্তি কেবল একটি ভিসা নিয়েই সর্বত্র যাতায়াত করতে পারেন। ব্রিটেন নিজেকে শেঙ্গেন ভিসার আওতার বাইরে রাখলেও ব্রিটেন এবং EU এতকাল পরস্পরের নাগরিকদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে এসেছে, যাতে তারা EU-এর সমস্ত সদস্য দেশেই জীবিকার সন্ধানে যেতে পারেন। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা ব্রিটেনে এবং ব্রিটিশ নাগরিকরা অন্যান্য দেশে অবাধে যাতায়াত শুরু করে। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে যখন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি শেঙ্গেন চুক্তির আওতায় চলে আসে, পশ্চিমমুখী অভিবাসীদের যে বিপুল জনস্রোত শুরু হয়, তার একটা বড় অংশেরই গন্তব্য ছিল ব্রিটেন। বর্তমানে EU-এর প্রায় ৩৩ লক্ষ নাগরিক ব্রিটেনে বসবাসরত, যার মধ্যে ৮ লক্ষ এসেছে শুধু পোল্যান্ড থেকে। পক্ষান্তরে প্রায় ১২ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত। ব্রেক্সিটের পরে এদের কী হবে তা একটা বড় প্রশ্ন।

এই সমস্যাটি প্রকৃতই জটিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে ২৩ জুনের গণভোটের এহেন কর্মনাশা পরিণামের কারণ অভিবাসন এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জনমানসের একটি বড় অংশের মধ্যে বিপুল ক্ষোভ জমে আছে। ব্রিটনের চিরকালই EU-এর তরফে নেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নেবার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকত, কারণ ব্রিটেন মনে করত দেশীয় সমস্যাগুলির সুরাহার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারে নির্বাচিত দেশীয় সরকারের হাতে থাকাই শ্রেয়। ব্রাসেলস-এর নিদান নিয়ে ব্রিটিশদের সব থেকে বেশি আপত্তি ছিল ইউরোপের অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি নিয়ে। এই নীতি অনুসারে ইউরোপে বসবাসকারী যে কোনও লোকেরই ইউরোপের অন্য যে কোনও দেশে যাওয়ার অবাধ অধিকার থাকত। ব্রিটেন সেই অধিকার EU-এর নাগরিকদের দিতে রাজি হলেও বসবাসকারী মাত্রেরই সেই অধিকার মেনে নেয়নি। মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে স্থানচ্যুত লক্ষ লক্ষ মানুষ ইউরোপে উদ্বাস্তু হিসাবে উপস্থিত হবার পরে এই ভীতির সঞ্চার হয় যে উদ্বাস্তুদের ঢেউ অচিরেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও আছড়ে পড়তে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন এই ভীতির ফলেই ২৩ জুনের গণভোটের রায় ব্রেক্সিটের পক্ষে গেছে। সেক্ষেত্রে EU নাগরিকদের ব্রিটেনে থেকে যাবার অধিকার দিলে তা জনগণের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে, ব্রিটেন যদি EU-এর নাগরিকদের ব্রিটেন থাকার অধিকার দিতে অসম্মত হয়, সেই একই অধিকার EU ইউরোপে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের দিতেও অস্বীকার করতে পারে।

✶ ✶ ✶ ✶

ব্রেক্সিটের সবথেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে চলেছে EU-এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং EU-এর সাংগঠনিক চরিত্রের ওপরে। বেশ কিছু কাল ধরেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বাড় হয়ে চলেছে, বাড়ন্ত যার মূল আধার হল বিদেশ এবং বিদেশি-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদী দলগুলি; যারা তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ব্রাসেলসের হাত

থেকে পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হবার পর থেকে, ইউরোপের সর্বত্র যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয় তার ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রধানত সেই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত লোকেদের মধ্যেই EU-এর প্রতি এক ধরনের বিরাগ জন্মাতে শুরু করে। এর ফলে লাভবান হয় এই দক্ষিণপন্থী দলগুলি, যার অন্যতম নিদর্শন ছিল নাইজেল ফারাজ-এর United Kingdom Independence Party, যারা বারংবার ব্রিটেনকে ব্রাসেলস-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার কথা বলে এসেছে। গণভোটের ফলাফলের পরে অনুরূপ কর্মসূচির প্রবক্তা ফরাসি নেত্রী মারি দু প্যাঁ এবং ওলন্দাজ নেতা Geert Wilders যথাক্রমে ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডস-এও অনুরূপ গণভোটের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। উদারপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি; যেমন—ব্রিটেনের লেবার বা রক্ষণশীল, জার্মানির খ্রিস্টান বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলি, ফ্রান্সের রিপাবলিকান বা সমাজতন্ত্রী দল—সকলেই আজ অনেকখানি কোণঠাসা, কারণ ব্রাসেলস-এর নিয়ন্ত্রণ মন্দার সময়ে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা হারিয়ে চলেছে।

কতকটা এই কারণেই EU-এর সামনে ব্রিটেনের প্রতি নরম মনোভাব নিতে পারার সম্ভাবনা খুব কম। ব্রেক্সিটের ব্রিটিশ প্রবক্তারা আশা রাখছেন যে ব্রিটিশ বাণিজ্য EU-এর জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, লন্ডনের প্রতি ব্রাসেলস নরম মনোভাব নিতে বাধ্য, বিশেষত যেহেতু EU-এর বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানির কাছে ব্রিটিশ বাণিজ্যের আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বাস্তবিকভাবে EU-এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জার্মানি ফ্রান্স-কে সামলাতে ব্রিটেনকে ব্যবহার করত, ফলে তারা প্রকৃতই চায় যে কোনওভাবে ব্রিটেনকে EU-এর সঙ্গে যুক্ত রাখতে। কিন্তু ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয়েই মনে করে যে EU-এর সমস্যাগুলি দূর করতে EU-এর কেন্দ্রীকরণ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যা এতদিন ব্রিটেনের বিরোধিতায় থমকে ছিল। আজ ব্রেক্সিটের ফলে সেই বাধা কার্যত দূর হয়ে যেতে চলেছে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের প্রতি কড়া অবস্থান নিলে তা ভবিষ্যতে অন্য কোনও দেশ EU-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে সেই দেশের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু নরম অবস্থান নিলে তা অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে উৎসাহ দেবারই সামিল হবে। তাই জার্মান অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্রিটেনের প্রতি নরম অবস্থান নিতে চাইলেও EU-এর স্বার্থেই ব্রিটেনকে ব্রেক্সিটের জন্য চড়া দাম দিতে হবে এবং সেই বিষয়ে আলোচনা প্রলম্বিত হতে বাধ্য। বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তাও তাই সহজে দূর হবে না।❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও ইনস্টিটিউট অফ ফরেন পলিসি স্টাডিজ-এ অতিথি শিক্ষক। আমেরিকান সেন্টার-এর ফরেন পলিসি স্টাডি সার্কেল-এর বর্তমান সেক্রেটারি। ইমেল : kchat18@gmail.com)

প্রজ্ঞা
FOR W.B.C.S.
যোগাযোগ
Admission Help Line: - 9002490487 / 9593601807/ 8967065857
স্থান :- তারামনি মেমোরিয়াল (Main Office), হিজলপুকুরিয়া, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা (পৌরসভার পাশে)

এই নিবন্ধটি তাদের জন্য যারা এবারে W.B.C.S. Prelims Crack করতে পারলে না।

এবারও হল না প্রিলি? এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু কেন যে হল না, এত পরিশ্রম পন্ডশ্রম হয়ে গেল, দূর ছাই - কারেন্ট আফেয়ার্সের Question গুলো যেন কেমন ছিল । সংবিধান, অর্থনীতির প্রশ্ন গুলো কেমন যেন পাল্টে গেছে। কি যে করি। আসলে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কার্যকারণ সম্পর্কে বাধা, ব্যর্থতার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। কিন্তু কারণ গুলি কি?

১) P.S.C এর বদলে যাওয়া Pattern আয়ত্ত না করতে পারা। ২) উপযুক্ত বই যা পড়লে সাফল্য নিশ্চিত তা নির্বাচন না করতে পারা। ৩) কতটা পড়ব, কি পড়ব বুঝতে না পারা। ৪) Hall Situation manage করতে না পারা মানে– পরীক্ষায় প্রশ্ন কতটা কঠিন তা অনুযায়ী কতটা প্রশ্ন Attend করব, Confusing question গুলো Attend করব কি , করব না decision নিতে পারা, কোন প্রশ্ন Attend ই করব না বুঝতে না পারা। ৫) Silly mistake এড়াতে না পারা।

কিন্তু এখন উপায়? সর্বোত্তম উপায় হল পরীক্ষাটি যারা সফল ও নতুন Pattern এ প্রাজ্ঞ তাদের উপযুক্ত Guidance নিজেকে ক্ষুরধার করে তোলা। আর প্রজ্ঞা -ই এক মাত্র সঠিক প্রতিষ্ঠান যেখানে নতুন Pattern এ প্রাজ্ঞ W.B.C.S অফিসারদের Guidance ক্লাস করানো হয়।

কিন্তু অসংখ্য Competitive Exam Institute -এর মধ্যে 'প্রজ্ঞা'-ই একমাত্র সঠিক প্রতিষ্ঠান কারন আমরা-

১) নতুন Pattern -এ সাফল্যের চাবি কাঠি লুকিয়ে Concept গড়ে তোলায়। তাই আমরা নোটস দিই না, Concept গড়ে তোলায় বিশ্বাসী। ২) নতুন Pattern অনুযায়ী তৈরী Question Paper -এ নিয়মিত Mock Test নেওয়া ও তার সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়। ৩) Audio Visual Aid (Projector, Map Study) - এর মাধ্যমে ক্লাস করানো হয়। ৪) ছোট ছোট ব্যাচ, Individual Care এর ব্যবস্থা করি।, ৫) আর নতুন Pattern এর জন্য উপযুক্ত বই এর হদিস দেওয়া হয়।

তাই আমরা বলি, আমরাই পারি এই বদলে যাওয়া সময়ে তোমাকে পৌছে দিতে তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে।

# জাতীয় অর্থনীতিতে GST-র সম্ভাব্য প্রভাব

## একটি পর্যালোচনা

*একশো পঁচিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা বর্তমানে চার কোটির কিছু বেশি। যা কি না উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক অনেকটাই কম। এদিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালানোর জন্য কর আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। কাজেই নজর দিতে হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়ানোর উপর। বর্তমানে দেশে যে অপ্রত্যক্ষ কর বিন্যাস চালু আছে তা একদিকে যেমন জটিল ও সমস্যাপূর্ণ; অন্যদিকে, তেমনি প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের অনুকূল নয়। এই পরিস্থিতিতে, বর্তমানের সমস্ত স্তরের অপ্রত্যক্ষ করগুলিকে 'পণ্য ও পরিষেবা কর' (Goods and Services Tax বা GST) নামে একটি কর বিন্যাসের আওতায় আনার প্রচেষ্টা তথা প্রক্রিয়া চলছে বহুদিন ধরেই। গত বছর (২০১৫) লোকসভার পাস হওয়ার পর গত ৩ আগস্ট, ২০১৬ সালে এই GST বিলটি পেশ করা হয় রাজ্যসভায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে GST-এর বিবিধ দিক নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন—*****ড. বিবেক রায়চৌধুরী** ও **ড. তৃপ্তেন্দুপ্রকাশ ঘোষ**

উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে কর আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব জোগাড় করাটা বরাবরই একটা কঠিন কাজ। একদিকে যেমন রাজস্ব বিনা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। অন্যদিকে তেমনই কর (বিশেষ করে অপ্রত্যক্ষ কর) পণ্য ও পরিষেবার মাসুল বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলির চাহিদা কমিয়ে দেয়। যার ফলে বৃদ্ধি কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। অপ্রত্যক্ষ কর বাদ দিলে পড়ে থাকে প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব আদায়ের জন্য তখনই কার্যকরী হয়, যখন অন্তত দু'টি শর্ত পূরণ হয় :

(ক) জনসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা যথোপযুক্ত হয়, এবং

(খ) করদাতাদের করযোগ্য আয়ও যথেষ্ট হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা বর্তমানে চার কোটির কিছু বেশি (অর্থাৎ, জনসংখ্যার তিন শতাংশের সামান্য ওপরে)। যা কিনা উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই কম। এই পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ি হল জাতীয় অর্থনীতিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সুবিশাল আকার। নব্বই শতাংশেরও বেশি শ্রমের চাহিদা আসে এই ক্ষেত্র থেকে। অসংগঠিত শ্রমের আয়ের ওপর কর বসানো কার্যত অসম্ভব। কারণ, না এই ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব নথিবদ্ধ হয়; না এই ধরনের শ্রমে আয় সংগঠিত ক্ষেত্রের আয়ের করযোগ্যতার মাপকাঠিতে যথোপযুক্ত।

এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালানোর জন্য রাজস্ব আদায় করতে প্রায় সমস্ত উন্নয়নশীল দেশকেই আয়ের ওপর করের থেকে বহুগুণ বেশি নির্ভর করতে হয় ব্যয়ের (অর্থাৎ, ভোগের বা উৎপাদনের) ওপর করে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ; আয়করের ক্ষেত্রে যেমন বেশি আয়ের ওপর শতাংশের ভিত্তিতে বেশি হারে আয়কর দিতে হয় (অর্থাৎ, ধনীদের আয়করের হার বেশি হয়)। অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এক দরিদ্রতম ক্রেতা একটি দেশলাই কিনলে যে পরিমাণ অপ্রত্যক্ষ কর দেয়, তার থেকে সহস্র বা লক্ষ গুণ ধনী ক্রেতাও ওই দেশলাইটি কিনলে একই পরিমাণে কর দেয়। অবশ্য প্রাথমিক পণ্য (যথা, খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি)-এর ওপর কম (বা শূন্য) হারে কর বসিয়ে এবং বিশালবহুল পণ্য (যথা, বাতানুকূল যন্ত্র, ব্যক্তিগত গাড়ি ইত্যাদি)-এর ওপর উচ্চতর হারে কর বসিয়ে কিছুটা সাম্য আনার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

### ভারতে GST-পূর্ববর্তী অপ্রত্যক্ষ কর বিন্যাস

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে ভারতে বর্তমান অপ্রত্যক্ষ কর বিন্যাসের ওপর এবার চোখ বোলানো যাক। এ দেশে সব স্তরের সরকারই (কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় যথা, পুরসভা) অপ্রত্যক্ষ কর বসায় এবং আদায় করে। অতীতে (এমনকি ১৯৯০-এর দশকেও) কেন্দ্রীয় সরকার বসাতো কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক (Union Excise Duty বা UED) এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয় শুল্ক (Central Sales Tax বা CST), রাজ্য সরকারগুলি বসাতো সাধারণ বিক্রয় শুল্ক (General Sales Tax বা ST), প্রবেশ শুল্ক (Entry Tax), প্রবেশ কর (Entry tax) এবং বিদ্যুৎ শুল্ক (Electricity duty, যা বিদ্যুৎ-এর মাশুল বা দামের একটা অংশ); আর কয়েকটি রাজ্যের পুরসভাগুলি বসাতো অকট্রয় (Octroi)। এর মধ্যে CST কেন্দ্র সরকার বসালেও আদায় ও ব্যবহার করত রাজ্য সরকারগুলি।

অপ্রত্যক্ষ করের এই বিন্যাসের ফলে অনেকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

(১) UED এবং CST-র হার কোনও একটি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে মোটামুটি এক

হলেও বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে হারের বিস্তর ফারাক ছিল এবং এখনও আছে। এর ফলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর হার বিভিন্ন। ফলত, যেখানে উৎপাদনের পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ হেরফের করা সম্ভব, সেখানে কম করের উপাদান বেশি ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর তা হলে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বা কুশলতার অভাব প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা।

(২) রাজ্য সরকারের বসানো শুল্কগুলির ক্ষেত্রে কেবল যে করের হার রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা তাই নয়; একই পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে করের হারের বিশাল পার্থক্য আছে। এর ফলে আন্তঃরাজ্য (Inter-State) ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমূহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমত, এক রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য অন্য রাজ্যে ব্যবহার হলে (উৎপাদনের জন্যই হোক বা অন্তিম ভোগের জন্যই হোক) পণ্যের দাম নির্ভর করে কোন রাজ্যে উৎপাদন হচ্ছে এবং কোন রাজ্যে ব্যবহার হচ্ছে তার ওপর। এর ফলে উৎপাদন শিল্পের সেই জায়গায় সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেখানে উৎপাদনের উপাদান সব চেয়ে সস্তা। অবশ্য অন্যান্য বিষয়, যথা, পরিকাঠামো, বাজারের নৈকট্য, ব্যবসা করার সুবিধা ইত্যাদিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উৎপাদকদের এই সুবিধা থাকলেও উপভোক্তাদের নেই। দ্বিতীয়ত, একই কথা প্রযোজ্য রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন রাজ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে দক্ষতা রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ওপর নির্ভর তো করবেই, কিন্তু নিজের ছাড়া অন্য রাজ্যের আরোপিত বিভিন্ন শুল্কের হারের ওপরও নির্ভর করবে। এর ফলে যে অদক্ষতা জন্মায় (সব ক্ষেত্রেই—অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, এমনকি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও) তা পুরোপুরি অপ্রত্যক্ষ কর বিন্যাসের ফলস্বরূপ।

(৩) অন্তিম পর্যায়ের ভোগ্যপণ্য ও পরিষেবা বাদ দিলে বাকি সব ক্ষেত্রেই একজন উৎপাদকের উৎপাদনই আর একজন উৎপাদকের উৎপাদনের উপাদানবিশেষ। ফলত, প্রত্যেক উৎপাদনে এবং/অথবা প্রত্যেক পণ্য/পরিষেবার বিক্রয়ে বিভিন্ন রকম অপ্রত্যক্ষ কর বসার ফলে দুই, তিন বা তার বেশি বার কর দিতে হয়। যার ফলে করের ওপর কর বসে যায়, যা কি না অদক্ষতা ও উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে তোলে। অর্থনীতিবিদরা একে বলেন ক্যাসকেডিং (Cascading effect)।

(৪) আমদানি করা পণ্যের ওপর কেন্দ্র সরকার তিন/চার রকম শুল্ক বসায়। বেসিক কাস্টমস ডিউটি (BCD), স্পেশাল ডিউটি (SD), কাউন্টার ভেইলিড ডিউটি (CVD), স্পেশাল অ্যাডিশনাল ডিউটি (SAD), ইত্যাদি। আমাদের কাছে এগুলির মধ্যে CVD বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানিকারক দেশগুলি, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলি, যখন রপ্তানি করে তখন সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর সমস্ত অভ্যন্তরীণ শুল্ক হয় উৎপাদককে ফেরত দেয়, নয় তো উৎপাদককে ওই শুল্ক দিতেই হয় না। অন্যদিকে, আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের ওপর এক্সাইজ ডিউটি বা উৎপাদন শুল্ক বজায় থাকে। এর ফলে আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের থেকে বেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই অসাম্য ঠেকাতে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর CVD বসানো হয়। যাতে দেশে উৎপাদিত পণ্যের ওপর প্রদান করা উৎপাদন শুল্কের প্রভাব প্রশমিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে অতীতে দেখা গিয়েছে যে, CVD হার এবং উৎপাদন শুল্ক আলাদা। তাছাড়াও যদি আমদানি করা পণ্য ডিলার বা আমদানি ব্যবসাকারী (merchant inporter) অন্য কোন ব্যবহারকারীকে বিক্রি করে তা হলে সেই পণ্যের উপর বিক্রয় শুল্ক (কেন্দ্র ও রাজ্যের) বসত। কিন্তু সেই একই পণ্য যদি কোনও নথিবদ্ধ উৎপাদক নিজের ব্যবহারের জন্য সরাসরি আমদানি করত, তাহলে ওই বিক্রয় শুল্ক বসত না। এর ফলে আমদানি করা পণ্য উৎপাদন হিসেবে ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির উপাদান খরচ বড় ও নথিবদ্ধ শিল্পের তুলনায় বেশি পড়ত বা এখনও পড়ে।

(৪) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আর্থ-সামাজিক এবং কৌশলগত কারণে বিভিন্ন পণ্যের শুল্কের ওপর ব্যবহারকারী বিশেষে বা ভৌগোলিক অঞ্চল অনুসারে ছাড় দেওয়া হয়েছে। যথা, হাসপাতালে ব্যবহার্য যন্ত্রের ওপর, সরকার দ্বারা আমদানি করা আর্মার্ড গাড়ির ওপর, তথা উত্তরাঞ্চলে বা দমন-দিউ-তে উৎপাদন হল শুল্ক ছাড়, ইত্যাদি। এছাড়াও, ক্যাসকেডিং এফেক্ট কমাতে ১৯৮৫-'৮৬ সালে যুক্তমূল্য কর নীতিতে (Principle of Value Added Tax বা VAT) মডভ্যাট (Modified VAT বা MODVAT) আনা হয়। ধীরে ধীরে MODVAT-এর পরিধি বাড়িয়ে (এবং পরিবর্তিত CENVAT এনে) প্রায় সমস্ত পণ্যকেই (যার ওপর UED বসানো হয়) এর আওতায় আনা হয়। MODVAT/CENVAT-এর ফলে উৎপাদকরা যে উপাদানগুলি কিনে উৎপাদনে ব্যবহার করছেন সেই উপাদানগুলির ওপর দেওয়া UED-র পরিমাণ ছাড় পায় তাদের প্রদেয় কর হিসাব করার সময়। বিভিন্ন সময়ে MODVAT-এ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে (শেষ বড় পরিবর্তন সম্ভবত ২০১০-'১১ সালের বাজেটে)। রাজ্য সরকারগুলিও কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ছাড় দিত বা দেয়; বিশেষ করে যখন উপাদান ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রাজ্য সরকারি করের আওতায় আছে এবং তা অন্য রাজ্যে বা দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বহুসংখ্যক (কর) হার। ১৯৯০-এর দশকে অন্তত ৩৫০-টি হার ছিল UED-র আর অন্তত আরও চল্লিশটি ছিল মূল্যভিত্তিক করের (ad valorem tax) হার। এছাড়াও ছিল কর সম্পর্কিত আইন-কানুন ও নিয়মাবলীর অসংখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক, পরিবর্তন এবং ছাড়। এর পিছনে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, প্রশাসনের তাৎক্ষণিকতা (adhocism) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণ দায়ি (Burgess, Howes and Stern, 1995)।

মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদকদের পক্ষে উপাদনের ওপর দেওয়া করে ছাড় পেতে গেলে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম প্রশাসনিক ও নিয়মাবলীভিত্তিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কাজ

করতে হয়—একটি কেন্দ্র সরকারের এক্সাইজ দপ্তর এবং অন্যটি রাজ্য সরকারে বিক্রয় কর দপ্তর। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আইন-কানুন ও নিয়মাবলীর জটিলতা।

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আর একটি সমস্যা উদ্ভূত হল সংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে এক বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপস্থিতির ফলে। ধরা যাক ক একজন সংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদক যে একজন অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদক খ-এর কাছ থেকে একটি উপাদান কিনেছে। খ আবার তার উৎপাদনের জন্য একটি উপাদান ব্যবহার করেছে যার ওপর UED প্রদান করা আছে। এখন খ যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রভুক্ত হওয়ার জন্য (নথিভুক্ত নয়, অ্যাকাউন্টস নেই বা অডিটেড নয়) তার উপাদনের ওপর দেওয়া এক্সাইজ ডিউটির ছাড় পাবে না, তেমনি ক-ও খ-এর থেকে কেনা উপাদানের ওপর দেওয়া UED-র ছাড় পাবে না।

এই পরিস্থিতিতে শুধু যে উৎপাদকদের সামনে সমস্যা তৈরি হয়েছে তাই-ই নয়। এই জটিলতার সুযোগ নিয়ে উৎপাদকদের অনেকের মধ্যেই কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বিশেষ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে উৎপাদক ও সরকারের মধ্যে বিবাদ, এবং কোর্ট কেস-এর সংখ্যা। এর ফলে সরকারের রাজস্বের একটা বিশাল অংশ আটকে রয়েছে কোর্টের কেসের ফাঁদে। আর সময় নষ্ট হচ্ছে সরকারি আধিকারিক এবং উৎপাদকদের কর্মচারীদের। লাভবান হচ্ছেন শুধু আইনজীবীরা (যদিও তারা তাদের কর্তব্যই করছেন। এবং ন্যায্যভাবেই)!

মোদ্দা কথা হল অপ্রত্যক্ষ করের বিন্যাসে VAT নীতি ঢোকানো হলেও নানা কারণে এর থেকে প্রত্যাশিত ফল মোটেও পাওয়া যাচ্ছে না।

## GST-এর প্রস্তাবিত বিন্যাস

নতুন প্রস্তাবনায় সমস্ত স্তরের অপ্রত্যক্ষ করগুলিকে একটি করের মধ্যে সংযুক্ত করা হবে, যার নাম পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax বা GST)। সমস্ত রাজ্য সরকারি স্তরের করগুলিকে সংযুক্ত করা হবে, তার নাম State GST বা SGST এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অপ্রত্যক্ষ করগুলিকে সংযুক্ত করা হবে Central GST বা CGST-র সাথে। আন্তঃরাজ্য (Inter-State) ব্যবসা-র (বিক্রয়, বণ্টন বা distribution, ইত্যাদি) ওপর বসবে Integrated GST বা IGST। GST-র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, এটি বিক্রয় বা ভোগ নির্ভর (consumption oriented) কর। আর অতীতের (এখনও, মানে জুলাই, ২০১৬ সালের শেষ অবধি, বর্তমানেরও বটে) অপ্রত্যক্ষ কর ছিল একই সঙ্গে উৎপাদনভিত্তিক (এক্সাইজ ডিউটি) এবং বিক্রয় বা ভোগভিত্তিক (বিক্রয় কর)।

এই ফারাকের একটি ধীর গতির কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে। সেটা ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথমে SGST ও CGST-র কথা ধরা যাক। কোনও একটি রাজ্যের মধ্যে একটি পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন হয়ে ওই রাজ্যের মধ্যেই বিক্রয় হলে বিক্রয়ের সময় CGST এবং SGST বসবে। এবং এক্ষেত্রে CGST যাবে কেন্দ্র সরকারের কাছে এবং SGST যাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে। এই প্রথম ধাপেই ওই পণ্য/পরিষেবা অন্তিম ভোগে (final consumption) গেলে কোনও জটিলতা নেই। কিন্তু যদি তা না হয়, অর্থাৎ যদি ওই পণ্য/পরিষেবা কিনে কোনও উৎপাদক যদি অন্য কোনও পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন করে ও বিক্রয় করে (ওই রাজ্যের মধ্যেই) তখন তার ওপর আবার CGST এবং SGST দিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে দেওয়া CGST-র জন্য দ্বিতীয় ধাপে দেওয়া CGST-র উপর ছাড় (input tax credit) পাওয়া যাবে। একই জিনিস প্রযোজ্য SGST-র ক্ষেত্রেও।

এবার ধরা যাক বিহারের একজন উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্য পশ্চিমবঙ্গের আর এক উৎপাদককে বিক্রি করল। ধরা যাক, যুক্তমূল্য ১০০ টাকা, আর তার ওপরে IGST ২৪ টাকা। এছাড়া, ধরা যাক বিহারের উৎপাদক বিহার সরকারকে SGST দিয়েছে ২ টাকা, কেন্দ্র সরকারকে CGST দিয়েছে ২ টাকা। বিহারের উৎপাদক পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদকের থেকে দাম নেবে ১২৪ টাকা, কিন্তু কেন্দ্রকে IGST জমা দেবে ২০ টাকা (= ২৪ টাকা – ২ টাকা SGST – ২ টাকা CGST)। বিহার সরকার ওই ২ টাকা SGST ক্রেডিট (যেটা IGST থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে) কেন্দ্র সরকারকে পাঠিয়ে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদক যখন তার প্রদেয় কর থেকে বিহারের প্রদত্ত IGST-এর জন্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করবে, তখন কেন্দ্র সরকার বিহার থেকে প্রাপ্ত ২ টাকার SGST ক্রেডিট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করবে। এইভাবে আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়ে SGST সেই রাজ্য পাবে যেখানে পণ্যের ব্যবহার হবে, যেখানে উৎপাদন হবে সেখানে নয়।

এর ফলে যে রাজ্যগুলি শিল্পোন্নত, যথা তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তাদের রাজস্ব ধীরে ধীরে তুলনামূলকভাবে কমবে। আর যে রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বেশি এবং যেগুলি শিল্পে অনুন্নত, যথা, উত্তরপ্রদেশ এবং পূর্ব-ভারতের রাজ্যগুলি, সেগুলির রাজস্ব ধীরে ধীরে বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, দ্বিতীয় ধরনের রাজ্যগুলিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় বেশি।

## GST-র গঠনতন্ত্র ও পরিব্যাপ্তি

GST-র সমস্ত ব্যাপার দেখভাল করার জন্য GST পরিষদ OGST Council) গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পদাধিকার বলে এই পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীও এর সদস্য হবেন। প্রত্যেক রাজ্যের অর্থ বা রাজস্ব মন্ত্রী অথবা রাজ্য সরকার মনোনীত রাজ্যের যে কোনও একজন মন্ত্রী এই পরিষদের সদস্য হবেন।

এই পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি প্রয়োজন। পরিষদে রাজ্যগুলির সম্মিলিত ভোটাধিকার দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ, কেন্দ্র সরকার তার এক-তৃতীয়াংশ ভোটাধিকার বলে হাতে ভিটো ক্ষমতা (Veto power) রেখে দিচ্ছে।

GST-এর মধ্যে সমস্ত রকম করের হার, তার পরিবর্তন ইত্যাদি GST পরিষদ নির্ধারণ করবে। এমনকি রাজ্যগুলির হাতে SGST-র হার বাড়ানো কমানোর ক্ষমতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ফলে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধীনতাতে নিঃসন্দেহে বেড়ি পড়বে।

কেন্দ্রীয় সরকার IGST থেকে যে রাজস্ব পাবে সেটি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার জন্য আর্টিকল ২৬৯A লেখা হবে GST পরিষদের পরামর্শ অনুসারে, এবং পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই তা পাস হতে হবে। এছাড়া CGST থেকে আদায় করা রাজস্ব এবং IGST রাজস্বের কেন্দ্র সরকারের অংশ রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন হবে প্রচলিত রীতি অনুসারে (যা সংবিধানের ২৭০ ধারায় বা Article-এ ব্যাখ্যা করা আছে)।

প্রায় সমস্ত পণ্য এবং পরিষেবাই GST-র আওতায় আসবে। ব্যতিক্রমগুলি হল : (১) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যগুলিকে GST-র আওতাভুক্ত পণ্য বলে বিশেষিত করা হলেও আগের মতোই কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি শুল্ক (বিক্রয় শুল্ক/ভ্যাট, CST এবং UED) বসাতে থাকবে। এই ব্যবস্থা ততদিনই চলবে যতদিন GST পরিষদ মনে করছে যে তা চলা উচিত। (২) তামাক ও তামকাজাত পণ্য GST-র আওতায় আসা সত্ত্বেও (অর্থাৎ SGST, CGST এবং IGST কর বসানো সত্ত্বেও) কেন্দ্রীয় সরকারের বসানো সব শুল্কই এর উপর বজায় থাকবে। এর কারণ হল সরকারের ঘোষিত তামাকবিরোধী অবস্থান। (৩) পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত সুরা GST-র আওতায় আসবে না, এবং রাজ্য সরকারগুলি আগের মতো শুল্ক (স্টেট এক্সাইড ডিউটি এবং বিক্রয় কর/ভ্যাট) চাপাবে এসব পণ্যের ওপর।

যেহেতু রাজ্য সরকারের বসানো ও আদায় করা সমস্ত শুল্কই (উপরোল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিয়ে) GST-এর মধ্যে SGST-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিছু রাজস্ব হারানোর সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল SGST, CGST এবং IGST-র হার কী হবে? যদিও এখনও এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই, তবুও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ১২ শতাংশ SGST এবং ১৪ শতাংশ CGST-র কথা ভাবা হচ্ছে। আসল হারগুলি এর খুব কাছাকাছিই থাকবে। কারণ, বিশেষজ্ঞরা অনেক হিসেব-নিকেশ করে বলেছেন এই রকম হারই রাজস্ব-র ওপর সব থেকে কম প্রভাব ফেলবে। GST-র করগুলির যে হারের জন্য GST চালু হওয়ার অব্যবহিত আগে ও অব্যবহিত পরে রাজস্বের পরিমাণে কোনও পরিবর্তন হয় না, তাকে Revenue neutral rate বলে।

কিছু রাজ্যে কিছু কিছু পণ্যের হার GST-র থেকে বেশি আছে। সেক্ষেত্রে GST-র ফলে কিছু রাজস্ব কমবে। উলটো ব্যাপারও ঘটতে পারে; কিছু কিছু রাজ্যে এবং কিছু কিছু পণ্যে। মোটের ওপর, বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম প্রথম রাজ্যগুলির কিছু রাজস্বহানি হবে। GST চালু হওয়ার পরে পাঁচ বছর ধরে GST পরিষদের উপদেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সেজন্য রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বহানির ক্ষতিপূরণ দেবে।

## জাতীয় অর্থনীতিতে GST-র সম্ভাব্য প্রভাব

জাতীয় অর্থনীতিকে GST প্রভাবিত করতে পারে চার ভাবে : পণ্য ও পরিষেবার মূল্য, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, রাজস্ব (বাজেট বা ফিসক্যাল ডেফিসিট) এবং বিদেশি মুদ্রায় চালু খাতার পরিস্থিতি (Current account balance)। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই পর্যায়ে কোনও ক্ষেত্রেই কী প্রভাব আদৌ হবে তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। কেবল সম্ভাবনাগুলির কথাই আলোচনা করা যায়।

প্রথমত, পণ্য ও পরিষেবার মূল্য। যেহেতু GST-র ক্ষেত্রে রাজস্ব নিরপেক্ষ (revenue neutral) করের হারের কথাই ভাবা হয়েছে, পণ্যের মূল্যে কোনও পরিবর্তন না আসারই কথা। তবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম পণ্যের মূল্য অল্পবিস্তর বাড়তে বা কমতে পারে। এই পরিবর্তন হবে একবারের জন্য। মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতির ওপর (অর্থাৎ, বছরে বছরে মূল্যের বৃদ্ধি) এর প্রভাব খুবই সীমিত হওয়ারই কথা।

পরিষেবার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু আলাদা। বর্তমানে যে পরিষেবাগুলি করের আওতায় আছে, সেগুলির মূল্য GST-র পরে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম এবং হলেও খুবই সামান্য পরিমাণে হবে। কিন্তু, যেহেতু প্রায় সমস্ত পরিষেবাই GST-র আওতায় আসবে, সেহেতু যে পণ্যগুলির ওপর বর্তমানে এখন পরিষেবা কর বসানো হয় না, সেগুলির ওপর GST বসলে সেই পণ্যগুলির দাম অনেকটা (প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ, যদি বর্তমানে প্রস্তাবিত হার গৃহীত হয়) বাড়বে (Kumar, ২০১৫)। তবে এই বৃদ্ধিও একবারের জন্য, অর্থাৎ মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রভাব খুবই সামান্য হবে।

পণ্যের মূল্যের ওপর এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে তার মুদ্রাস্ফীতির ওপর ST-র আর একটি প্রভাব আছে। যেহেতু পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যগুলিকে আপাতত GST-র করের আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে, সেহেতু এগুলির ওপর ধার্য করা করের (রাজ্য এবং কেন্দ্রের) হারের পরিবর্তন না হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলির দামের ওঠা-পড়ার ওপর নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ করও পরিবর্তিত হতে থাকবে। এই পণ্যগুলির কর-পরবর্তী দাম বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি হবে, তবে সেটা করজনিত কারণে নয়। যেহেতু এই পণ্যগুলির ওপর করগুলি GST-র বাইরে, সেহেতু উৎপাদকরা কোনও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না। অর্থাৎ, করের পরিমাণের বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। এই প্রভাব বেশি হবে সেই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে যেগুলি অন্তিম উপভোক্তার হাতে যাওয়ার আগে অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করে। যেমন, খাদ্যশস্য, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, বিভিন্ন ফল, প্রক্রিয়াজাত খাবার, সিমেন্ট, স্টিল, গাড়ি ও তার যন্ত্রাংশ, এবং আরও অনেক। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে UED কমিয়ে দিয়ে অভ্যন্তরীণ দাম অপরিবর্তিত রাখতে পারে, তাহলে এই সমস্যা উদ্ভূত হবে না।

এবার আসা যাক রাজস্বের প্রসঙ্গে। যেহেতু GST-র করের হারগুলিকে যতদূর সম্ভব রাজস্ব নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই রাজ্য ও কেন্দ্রের মোট রাজস্বের পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যদিকে, নতুন পরিষেবাগুলি (যেগুলি এখন করযোগ্য নয়) GST-র আওতায় এলে কেন্দ্রের রাজস্ব কিছুটা হলেও বাড়ার সম্ভাবনা। শুরুর দিকে (অর্থাৎ, অন্তত প্রথম পাঁচ

বছর) যে রাজ্যগুলির রাজস্বহানির সম্ভাবনা খুবই বেশি সেটা তো প্রস্তাবিত GST বিলে রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে, GST কার্যকরী হওয়ার পরে যত দিন যাবে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির আনুপাতিক রাজস্ব ততো কমবে (যথা, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, হরিয়ানা) আর জনসংখ্যাবহুল এবং শিল্পে অনুন্নত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে (যথা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা) ঘটবে উলটোটা। এবং স্থিতাবস্থা আসার আগে এই প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক বছর ধরে চললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এবারে আসা যাক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কথায়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হল চাহিদা এবং বিনিয়োগ। চাহিদা বাড়ে হয় উপভোক্তার আয় বাড়লে অথবা পণ্য ও পরিষেবার মূল্য কমলে। GST-র ফলে উপভোক্তার আয় বাড়ার সম্ভাবনা (অন্তত স্বল্পমেয়াদে) প্রায় নেই বললেই চলে, আর পণ্য ও পরিষেবার মূল্যেরও খুব একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাহলে পড়ে থাকে বিনিয়োগ।

শিল্প মহল এবং নীতি নির্ধারকদের আশা যে GST-র ফলে দেশ জুড়ে একটাই সাধারণ বাজার তৈরি হবে, যেখানে উৎপাদনের উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা মুক্ত বাণিজ্যের মতো বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারবে। GST-পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষে এক-একটি রাজ্য এক-একটি আলাদা বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য স্তরের অপ্রত্যক্ষ কর বিন্যাস এবং অন্যান্য আইন-কানুনের জন্য। যদি এই আশা বাস্তবে পূর্ণ হয়, তাহলে উৎপাদকদের উৎপাদন খরচ কমবে, পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা ও শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে। তবে সেই ফল লাভ GST আসার সঙ্গে সঙ্গেই হবে না, সময় লাগবে বেশ কয়েক বছর। কিন্তু এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কতগুলি সম্ভাবনাও আছে। GST যদি সরকারের রাজস্ব বাড়ায় তখন পণ্য ও পরিষেবার মূল্য বৃদ্ধি হয়ে চাহিদা কমতে পারে। অন্যদিকে পণ্য ও পরিষেবার দাম কমলেও চাহিদা নাও বাড়তে পারে, যদি যেগুলির দাম কমেছে সেগুলি প্রধানত ধনী উপভোক্তারাই খরিদ করেন। NCAER (২০০৯) পরিসংখ্যান ও অর্থনতিক প্রতিকল্প (Economic Model) ব্যবহার করে আন্দাজ দিয়েছে যে GST-র ফলে জিডিপি (GDP)-র বৃদ্ধি বিভিন্ন সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে ০.০৪ শতাংশ থেকে ১.৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

*"বিশ্বের একশোটিরও বেশি দেশ GST-র মতো সুসংহত অপ্রত্যক্ষ কর আদায় ব্যবস্থা কার্যকরী করেছে (ICAI, ২০১৬)। আর সেটা করেছে সাম্প্রতিক অতীতে নয়, অনেক বছর আগেই। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা থেকে শতাধিক দেশ সুফল লাভ করেছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, GST ব্যবস্থায় প্রবর্তন আমাদের দেশের ভবিষ্যতের দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব (অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এর পক্ষে) এটা বোঝেন বলে একটা স্বমত (বা consensus) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা প্রায় সব দলই করছে, এবং আশা করা যায় যে, ২০১৬-এর মধ্যেই রাজ্যসভাতেও এই বিল পাস হয়ে যাবে (লোকসভায় পাস হয়েছে ২০১৫ সালে)।"*

এবার দেখা যাক GST আমাদের আমদানি ও রপ্তানির জন্য (অর্থাৎ, Current Account) কী বার্তা বহন করছে। অন্তত তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর কোনও অভ্যন্তরীণ শুল্ক থাকা উচিত নয়। নানা রকম পদ্ধতিতে কর ছাড় ও কর ফেরতের একটা অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থা বর্তমানে আছে। যাতে রপ্তানিকারকরা না সবটুকু অভ্যন্তরীণ করের থেকে ছাড় পায়, না সব রপ্তানিকারকরাই কোনও একটি পণ্যের ক্ষেত্রে উপলব্ধ/প্রাপ্তব্য সবটুকু ছাড় আদায় করতে পারে। শেষোক্তটি বিশেষ করে ঘটে ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে। GST এলে এই ক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতির বেশ ভালোই সম্ভাবনা। তার ফলে আমাদের রপ্তানিও বাড়ার সম্ভাবনা, কারণ GST-র ফলে কর ছাড় বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মূল্য কমবে ও বিশ্ববাজারে আমাদের পণ্য আরও বেশি বিক্রি হবে। তবে রপ্তানি আদতে কতটা বাড়বে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বিশ্ববাজারে চাহিদার ওপরে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়ে খুব একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যগুলিকে GST-র করের আওতার বাইরে রাখার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সমস্যা, তা রপ্তানি করা পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

GST আমদানির খরচ কমাতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করছে GST-র (বিশেষ করে SGST) হার বর্তমানে প্রযোজ্য বিক্রয় শুল্কের বেশি না কম তার ওপরে। রাজস্ব নিরপেক্ষ করের হারের যুক্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে আমদানির ক্ষেত্রে GST-র প্রভাব প্রায় থাকবে না বললেই চলে।

সুতরাং GST ভারতবর্ষের বিদেশি মুদ্রার চালু খাতায় (Current Account) সম্ভবত কিছুটা হলেও উন্নতি আনতে সমর্থ হবে।

## GST-র কয়েকটি বর্তমান সমস্যা

বিশ্বের একশোটিরও বেশি দেশ GST-র মতো সুসংহত অপ্রত্যক্ষ কর আদায় ব্যবস্থা কার্যকরী করেছে (ICAI, ২০১৬)। আর সেটা করেছে সাম্প্রতিক অতীতে নয়, অনেক বছর আগেই। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা থেকে শতাধিক দেশ সুফল লাভ করেছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, GST ব্যবস্থায় প্রবর্তন আমাদের দেশের ভবিষ্যতের দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আর আমাদের দেশের

রাজনৈতিক নেতৃত্ব (অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এর পক্ষে) এটা বোঝেন বলে একটা স্বমত (বা consensus) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা প্রায় সব দলই করছে, এবং আশা করা যায় যে, ২০১৬-এর মধ্যেই রাজ্যসভাতেও এই বিল পাস হয়ে যাবে (লোকসভায় পাস হয়েছে ২০১৫ সালে)।

এই বিষয়টা মাথায় রেখে এবার কতকগুলি বর্তমান সমস্যার দিকে নজর দেওয়া যাক। প্রথমত, রাজ্যগুলিকে রাজস্বহানির জন্য প্রথম পাঁচ বছরে কেন্দ্র ক্ষতিপূরণ দেবে বলে এবং শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির রাজস্বহানি বেশি হওয়ার সমভাবনা থাকার ফলে ১ শতাংশের একটি পণ্য জোগান কর (Supply of goods tax) বসানো হবে প্রথম দু'বছরের জন্য। এই কর বসাবে কেন্দ্র সরকার এবং আদায় করা রাজস্ব যাবে পণ্যের জোগান যে রাজ্য থেকে শুরু হয়েছে তার হাতে। এই দু'বছরের সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা থাকবে GST পরিষদের হাতে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সূত্র অনুসারে জানা যায় যে, শিল্প মহল আশঙ্কা করছে যে, পণ্য প্রত্যেক রাজ্য অতিক্রম করার সময় ১ শতাংশ করে কর বসে যাবে। এবং কোনও ক্ষেত্রে তা ৫-৭ শতাংশও হতে পারে (যেমন, মহারাষ্ট্র থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও কোনও রাজ্যে গেলে)। এই সম্ভাবনাকে খারিজ করতে গেলে যেটা দরকার তা হল GST Bill আইনে পরিবর্তিত হওয়ার পরে যে নিয়মাবলী তৈরি হবে, সেখানে কোনও ফাঁক-ফোকর না রাখা। এবং কাগজপত্রগুলিকে (Documentation) সহজ সরল রাখা।

দ্বিতীয়ত, GST কার্যকরী হওয়ার পরে এর সুবিধালাভ করতে গেলে ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবসায় উৎপাদনের খরচ সম্পর্কিত নথি ও কাগজপত্র বিষয়ে অনেক বেশি খুঁটিনাটি বিবরণ রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, আর তা সময় সাপেক্ষ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দু'পক্ষেরই হস্তক্ষেপ জরুরি। ICAI এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে, চ্যার্টার্ড এবং কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টদেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এই সমস্যার সমাধানে। প্রযুক্তিকে (যথা, internet, on-line platform, apps, ইত্যাদি) এই সমাধানের একটা (অঙ্গ) হিসেবে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়, অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাস্থ্য পরিষেবা বা আইনি পরিষেবার ওপর কর বসলে এবং এই পরিষেবা যখন একজন ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করেন তখন পুরো উপার্জনই সরকারের কাছে নথিবদ্ধ না করার সম্ভাবনা থাকে। আর এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে কর ফাঁকি ঠেকানোর উপায় প্রায় নেই বললেই চলে। আর যে একটি ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটি হল উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয়ের খরচ বাড়িয়ে দেখানো। এ সমস্যার ওপর অন্তত কিছুটা আলোকপাত আশা করা যায় GST আইন পরবর্তী নিয়মাবলীর মধ্যে। এটাও আশা করা অন্যায় হবে না যে যখন এই নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হবে, তখন অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার দিকেও নজর রাখা হবে।

চতুর্থত, বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ২.৫ (আড়াই) লক্ষ টাকা অবধি হলে SGST-র আওতায় এবং ১.৫ (দেড়) কোটি টাকা অবধি হলে ব্যবসায়ীকে CGST-র আওতায় পড়তে হবে না। যদিও এই সীমাগুলি খুবই কম, কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ না বাড়াতে চাওয়ার, বা একটি ব্যবসাকে ভেঙে দু'টি বা তার বেশি ব্যবসা হিসাবে ভেঙে দেওয়ার প্রবণতা জন্মাতে পারে। এই প্রবণতা রোখার জন্য GST আইন পরবর্তী নিয়মাবলীতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা দেখতে হবে।

পঞ্চমত, সব থেকে কঠিন সমস্যা সম্ভবত বিশাল এক অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপস্থিতি। মনে রাখা দরকার যে, এটা কিন্তু GST ব্যবস্থা প্রবর্তন করার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি। সমস্যাটি প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রের সেই সমস্ত উৎপাদকদের জন্য, যারা হয় সংগঠিত ক্ষেত্রকে উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে অথবা সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে (অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত) উৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ করে। GST আসার পরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের এক শ্রেণির ব্যবসায়ী বা উৎপাদক সংগঠিত ক্ষেত্রে ঢুকে পড়বে। এটা তারাই করতে পারবে যারা কস্টিং এবং অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। যারা এটা করতে পারবে না, তাদের উৎপাদনের খরচ, যারা পারবে তাদের তুলনায় করের ছাড় (input tax credit) না পাওয়ার জন্য বেশি হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই দ্বিতীয় উৎপাদকরা তখন ব্যবসায়ে টিকে থাকতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করছে সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় উৎপাদনের (কাঁচামাল ছাড়া) অন্য উপাদানগুলির খরচের ওপর—যথা, শ্রম এবং জ্বালানি।

পরিশেষে একটাই কথা বলার আছে। সমস্যার সমাধানই অগ্রগতির পথ। GST-ও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং খুব সম্ভবত তার একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ হতে চলেছে।❑

---

(**লেখক পরিচিতি** : লেখকদ্বয় IIFT-র কলকাতা ক্যাম্পাসে সহকারি অধ্যাপক। মতামত ব্যক্তিগত।)

**উল্লেখপঞ্জি** :

Kumar, A., 2015. Macroeconomic Aspects of Goods and Services Tax, Economic and Political Weekly, Volume 29, July, 19, 2015.

NCAER, 2009. Moving to Goods and Services Tax in India : Impact on India's Growth and International Trade, Prepared for the Thirteenth Finance Commission Government of India.

Agarwal, A., 2011. India's Goods and Services Tax—A Primer, STCI Primary Dealer's Limited.

Burgess, Robin, Stephen Howes, and Nicholas Stern, 1995. Value-Added Tax Options for India, International Tax and Public Finance, 2 : 109-141 (1995).

The Institute of Chartered Accountants of India, 2016. Background Material on Model GST Law. Accessed on July 29, 2016 from the website http://idtcicai.s3.amazonaws.com/download/BGM_ON_GST-25-7-16.pdf.

# জাতীয় সৌর মিশন

## সৌরশক্তিতে ভারতের অগ্রগতি

*আধুনিক সভ্যতা বড় বেশি জ্বালানি নির্ভর। এর বেশির ভাগটাই আবার জীবাশ্ম জ্বালানি। তেল-গ্যাস-কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পরিবেশ দূষণে বড় আসামি। দূষণের দরুন জলবায়ু পরিবর্তনের ঠেলায় জেরবার সব দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আবিশ্ব এককাট্টা। বিকল্প জ্বালানির জন্য চলছে জোর তৎপরতা। ভারতও এর শরিক। এত বেশি জনসংখ্যা ও দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির দরুন ও দেশে দরকার পরিচ্ছন্ন, ব্যয়সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস। দেশের শক্তি নিরাপত্তা ও জলবায়ু বদলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৌর শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ২০১০-এর জানুয়ারি চালু হয় জাতীয় সৌর মিশন। সূর্যকিরণ বেশি পড়ায় ভারতে সৌরশক্তির সম্ভাবনা ব্যাপক। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে ভারত বিশ্বের শীর্ষ ৬-টি দেশের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে। জাতীয় সৌর মিশনের কিছু সুলুকসন্ধান মিলবে এই নিবন্ধে। লিখেছেন—*****অরুণ কুমার ত্রিপাঠী**

### পটভূমি

দেশের শক্তি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৌর শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ২০১০-এর জানুয়ারিতে চালু হয় জাতীয় সৌর মিশন। রাজ্য, গবেষণা-বিকাশ প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ক্ষেত্রকে শরিক করে এই মিশন ভারত সরকারের এক বড়সড় উদ্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় ভারতের এই প্রয়াস এক বড় অবদান। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় অ্যাকশন প্ল্যান-এর অন্যতম অঙ্গ এই মিশন।

এত বেশি জনসংখ্যা ও দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতির দরুন ভারতের দরকার পরিচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস। সূর্যকিরণ বেশি পড়ায় ভারতে সৌরশক্তির সম্ভাবনা পর্যাপ্ত। দেশের অধিকাংশ জায়গা বছরে তিনশ দিনের মতো রোদ পায়। প্রতি বর্গমিটার ভূতলে সৌর বিকিরণ ৪-৬ কিলোওয়াট। দেশে মোট সৌরশক্তির সম্ভাবনা ৭৪৮.৯৮ গিগাওয়াট।

### মিশনের উদ্দেশ্য

উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতকে সৌরশক্তিতে বিশ্বের এক অগ্রণী দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে মিশনের উদ্দেশ্য। এই মিশন কার্বন নির্গমন কমানো এবং দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেও চায়।

মিশনের অন্যতম লক্ষ হচ্ছে ২০২২ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রিডে ২০ হাজার মেগাওয়াট সৌরশক্তি জোগান দেওয়া। তিনটি পর্যায়ে একাজ সম্পন্ন করা হবে (প্রথম পর্যায় ২০১২-১৩, দ্বিতীয় পর্যায় ২০১৩-১৭ এবং তৃতীয় পর্যায় ২০১৭-২২ সাল)।

সরকারের আর্থিক বোঝা ন্যূনতম করার জন্য, প্রথম পর্যায়ে এন টি পি সি-র বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগমের সঙ্গে জোড় বাঁধার কর্মসূচির মাধ্যমে ১ হাজার মেগাওয়াট সৌরশক্তি গ্রিডে জোগানোর ওপর নজর দেওয়া হয়। এছাড়া, ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট এজেন্সি লিমিটেড বা ভারতীয় নবীকরণযোগ্য শক্তি বিকাশ সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদনভিত্তির উৎসাহ (ইনসেনটিভ) দিয়ে ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের এক ছোট কর্মসূচিও ছিল।

দেশের শক্তি নিরাপত্তায় সৌরশক্তির অবদানের সম্ভাবনা, ফোটো ভল্টেইক বা পি ভি-র দাম কমা এবং দেশে সৌরশক্তি উৎপাদন দ্রুত বাড়ার বিষয়টি মাথায় রেখে ২০১৫-র জুলাই মাসে সরকার ২০২১-২২-এর মধ্যে সৌরশক্তি উৎপাদনের লক্ষ ১০০ গিগাওয়াটে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে ৬০ গিগাওয়াট আসবে বৃহৎ সৌর শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে। বাদবাকি ৪০ গিগাওয়াট জোগান দেবে গ্রিড সংযুক্ত ঘরবাড়ির ছাদের সৌর প্যানেল।

### রূপায়ণ কৌশল

নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক ২০২২ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ অর্জনের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি তৈরি করেছে। এসব কর্মসূচি রূপায়ণের স্ট্র্যাটেজি ও সাফল্য নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

**☐ জাতীয় সৌর মিশনের পর্যায় প্রথম :**

● এম টি পি সি-র বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম-এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে গ্রিডে জোগান দেবার জন্য ১০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা :

মিশনের প্রথম পর্যায়ে ৯৫০ মেগাওয়াট সৌরশক্তি উৎপাদনের প্রকল্প (মাইগ্রেশন স্কিমের ৮৪ মেগাওয়াট-এ হিসেবের বহির্ভূত) বাছাই করা হয়। রিভার্স বিডিং-এর মাধ্যমে দুই ব্যাচে (২০১০-১১-তে প্রথম ব্যাচ ও ২০১১-১২-য় দ্বিতীয় ব্যাচ) এই প্রকল্পগুলি মনোনীত করার কাজ চলে। এস পি ভি প্রকল্পের জন্য প্রথম ব্যাচে ইউনিট পিছু দাম ধার্য হয় ১০.৯৫ থেকে ১২.৭৩ টাকা। গড় দাম ছিল প্রতি ইউনিট ১২.১২ টাকা। এবং সৌর তাপ প্রকল্পের জন্য এই দাম ঠিক হয় r ১০.৪৯ ও r ১২.২৪। গড় দাম ছিল

ইউনিট প্রতি r ১১.৪৮। দ্বিতীয় ব্যাচে সোলার ফোটো ভেল্টেইক প্রকল্পের দাম ঠিক হয় ইউনিট পিছু ৭.৪৯ থেকে ৯.৪৪ টাকা। গড় দাম r ৮.৭৭। এই বিদ্যুৎ কিনে নিয়ে এন টি পি সি-র বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে। প্রথম পর্যায়ের দুই ব্যাচে (৩১.৩, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) মোট ৪২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা চালু হয়েছে। এছাড়া, মাইগ্রেশন স্কিমে ৫০.০ মেগাওয়াট, ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি উৎপাদনভিত্তিক ইনসেনটিভ কর্মসূচিতে ৮৮.৮ মেগাওয়াট এবং পুরনো ডেমনস্ট্রেশন স্কিমে ২১.৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার প্রকল্প-এর কাজ শুরু করেছে। সব মিলিয়ন, প্রথম পর্যায়ে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৫৮০.৮ মেগাওয়াট।

● সৌর ওয়াটার হিটার :

দেশে ৮০ লক্ষ বর্গমিটারের বেশি সৌর ওয়াটার হিটার বসেছে।

● সৌর অফ-গ্রিড ব্যবস্থা :

প্রায় ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার অফ-গ্রিড সিস্টেম চালু হয়েছে।

**□ জাতীয় সৌর মিশনের দ্বিতীয় পর্যায় :**

● সৌর পার্ক ও অতি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প :

মন্ত্রক নিদেন পক্ষে ২৫-টি সৌর পার্ক গড়ে তোলার এক কর্মসূচি শুরু করেছে। প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৫০০ মেগাওয়াট বা তার বেশি। ২০২২ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ পূরণেই মন্ত্রকের এই প্রচেষ্টা। ২০১৪-১৫ থেকে ৫ বছরের মধ্যে পার্কগুলি তৈরি হয়ে যাবে। হিমালয় লাগোয়া ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্গম ভূখণ্ডের প্রেক্ষিতে এক লপ্তে বেশি জমি মেলা দুষ্কর। কিছু রাজ্যে অ-কৃষি জমির দারুণ টানাটানি। এসব জায়গায় অবশ্য তুলনায় ছোট পার্ক তৈরির প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।

♦ সৌর পার্ক গড়ে তোলা হবে রাজ্য সরকার ও তাদের সংস্থাগুলির সহযোগিতায়। পার্ক তৈরি ও দেখভালের জন্য সংস্থা বাছাই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

♦ সৌর পার্ক প্রকল্পের জন্য r ৪০৫০ কোটি বাজেট সহায়তা দরকার।

♦ বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি, সমীক্ষা চালানো ইত্যাদির জন্য এই কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রক পার্ক পিছু r ২৫ লক্ষ কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য দেয়। এছাড়া, প্রতি মেগাওয়াটে r ২০ লক্ষ বা প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ-এর মধ্যে যেটি কম সে বাবদ মেলে কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য।

♦ এযাবৎ ২১-টি রাজ্যে মোট ২০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩০-টি সৌর পার্ক অনুমোদন পেয়েছে।

● খালপাড় ও খালের উপর সৌর পি ভি বিদ্যুৎ উৎপাদন :

♦ রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা, অন্যান্য রাজ্য সরকারি সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ১ থেকে ১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌর পি ভি বিদ্যুৎ কারখানা গড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য এই কর্মসূচি তৈরি হয়েছে। মোট ১০০ মেগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা আছে। এর মধ্যে খালের উপর ৫০ মেগাওয়াট ও খালপাড়ে ৫০ মেগাওয়াট। খালের উপর সৌর পি ভি প্রকল্পে প্রতি মেগাওয়াটে r ৩ কোটি বা প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম তা মূলধনী ভরতুকি বাবদ দেওয়া হবে। খালপাড়ের ক্ষেত্রে মেগাওয়াট পিছু r ১.৫০ কোটি বা প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম অঙ্কের তা মূলধনী ভরতুকি হিসেবে মিলবে। খালের উপর বা খালধারে অব্যবহৃত জায়গা বা জমির সদ্ব্যবহার ছাড়াও, এই কর্মসূচি রাজ্যগুলিকে নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ কেনার বাধ্যবাধকতা মেটাতে সক্ষম করবে। স্থানীয় মানুষের সুযোগসুবিধেরও ব্যবস্থা হবে।

♦ খালের উপর এবং খালের পাশে ৫০ মেগাওয়াট করে উৎপাদন ক্ষমতার বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কর্ণাটক, কেরল, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ।

● প্রতিরক্ষা সংস্থার সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

ভায়াবিলিটি গ্যাস ফান্ডিং এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং আধা সামরিক বাহিনীর সংস্থাগুলিতে এই কর্মসূচি ৩০০ মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। প্রতিরক্ষা সংস্থার জমি ও ভবনের ছাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো এই কর্মসূচির লক্ষ্য। সেইসঙ্গে, সৌর পি ভি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম দেশে তৈরির দিকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। ৩০০ মেগাওয়াটের মধ্যে, ১৫০ মেগাওয়াট বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে।

● কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করবে ১ হাজার মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

এই কর্মসূচির লক্ষ্য সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক দামে সৌর বিদ্যুৎ বেচার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে দেশি উৎপাদকদের কাছ থেকে সাজসরঞ্জাম কিনতে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে প্রেরণা জোগানো।

নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক ইতোমধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৯২৪.৫০ মেগাওয়াটের অনুমোদন দিয়েছে। অনুরোধ পাবার ভিত্তিতে বাদবাকি ক্ষমতা অনুমোদনের কাজ চলছে।

● বান্ডলিং মেকানিজমের আওতায় ৩০০০ মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

এই কর্মসূচি রূপায়ণ করছে এন টি পি সি। টেন্ডারের মাধ্যমে নির্ধারিত দামে সৌর পি ভি কারখানা থেকে সংস্থাটি সৌর বিদ্যুৎ কিনে নেবে। এবং তাপ বিদ্যুৎ কিনবে কেন্দ্রীয় নিয়ামক আয়োগের বেঁধে দেওয়া দামে। এই দুই বিদ্যুতের অনুপাত হবে ২ : ১ (২ মেগাওয়াট সৌর ও ১ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ)। এন টি পি সি এই বিদ্যুৎ ২৫ বছরের চুক্তিতে ইচ্ছুক রাজ্য সংস্থাগুলিকে বিক্রি করবে। এই প্রকল্পগুলির টেন্ডারের কাজ এখন বিভিন্ন ধাপে আছে।

● ভায়াবিলিটি গ্যাস ফান্ডিংয়ে ২ হাজার মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

এই কর্মসূচি 'বিল্ড, অন, অপারেট' ভিত্তিতে সোলার পাওয়ার ডেভলপারদের দিয়ে ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর পি ভি প্রকল্প গড়বে। মনোনীত ডেভলপার তার টেন্ডারের ভিত্তিতে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং পাবেন। ওপেন ক্যাটিগরির প্রকল্পে এই টাকার ঊর্ধ্বসীমা হবে মেগাওয়াট পিছু r ১ কোটি। এবং ডোমেটিক কনটেন্ট রিকয়্যারমেন্ট (ডিসিআর) ক্যাটিগরির আওতায় এর সর্বোচ্চ সীমা r ১.৩১ কোটি। বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি

অনুসারে গড় দাম দাঁড়াবে কিলোওয়াট পিছু r ৫.৭৯। প্রথম বছর দাম হবে প্রতি কিলোওয়াটে r ৫.৪৩। এরপর ২০ বছর ধরে ফি বছর কিলোওয়াট পিছু দাম বাড়বে r ০.০৫। বাদবাকি ৪ বছর দাম দাঁড়াবে প্রতি কিলোওয়াট r ৬.৪৩। এসব প্রকল্পে এখন টেন্ডারের কাজকর্ম চলছে।

● ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং-এর মাধ্যমে ৫০০০ মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

এই কর্মসূচি ঠিক আগেরটির মতোই। এতে অবশ্য উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০০০ মেগাওয়াট। ১২৫০ মেগাওয়াট করে চার ধাপে এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। প্রথম ধাপে দাম হবে আগের কর্মসূচির মত। এর পরের ধাপগুলিতে দাম কমবে কিলোওয়াট পিছু r ০.১০। এসব প্রকল্পের টেন্ডারের কাজ হচ্ছে।

● গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত ছাদের সৌর বিদ্যুৎ :

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা-সহ সরকারি ভবনের ছাদে ৪২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরিকল্পনা আছে এই কর্মসূচিতে। এজন্য ৩০ শতাংশ আর্থিক ইনসেনটিভ এবং অগ্রগতিকে ভিত্তি করে আরও কিছু ইনসেনটিভেরও সংস্থান আছে। এখাতে সরকার বরাদ্দ করেছে ৫০০০ কোটি টাকা। নেট মিটারিং ও সংযুক্তির জন্য এযাবৎ ২৭-টি রাজ্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আজ অবধি ছাদে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সাজসরঞ্জাম বসেছে।

## নতুন উদ্যোগ

● কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান/রাজ্যের ৫০০০ মেগাওয়াট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ :

এই কর্মসূচি আগেকার কর্মসূচিটির দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে রূপায়ণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিংয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হবে ৫০০০ মেগাওয়াটে। ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির জন্য দাম ঠিক হয়েছে কিলোওয়াট পিছু r ৪.৫০ অথবা বাজারের অবস্থার ভিত্তিতে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক দাম ধার্য করবে। টেন্ডারের মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই করা হবে। এই কর্মসূচি এখন অনুমোদনের অপেক্ষায়।

**সারণি-১**
**সাফল্য (৩১-০৫-২০১৬ তারিখ) নতুন ও নবীকরণযোগ্য মন্ত্রক কর্মসূচি/সাফল্য ২০১৬-১৭ ও ২০১৬ সালের মে মাসে**

| ক্ষেত্র | অর্থবছর ২০১৬-১৭ | | ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | সাফল্য | সাফল্য ৩১.০৫.২০১৬ সালে |
| ১. গ্রিড-ইন্টারঅ্যাকটিভ শক্তি (সক্ষতা মেগাওয়াট) | | | |
| বায়ুশক্তি | ৪০০০.০০ | ১০৬.৪০ | ২৬৯৩২.৩০ |
| সৌরশক্তি | ১২০০০.০০ | ৫৫৯.৭৮ | ৭৫৬৮.৬৪ |
| ক্ষুদ্র জল শক্তি | ২৫০.০০ | ১.৮০ | ৪২৮০.২৫ |
| জৈব শক্তি | ৪০০.০০ | ০.০০ | ৪৮৩১.৩৩ |
| বর্জ্য থেকে শক্তি | ১০.০০ | ০.০০ | ১১৫.০৮ |
| **মোট** | **১৬৬৬০.০০** | **৬৭০.৯৮** | **৪৩৭২৭.৬০** |
| ২. অফ-গ্রিড/ক্যাপটিভ শক্তি (সক্ষম মেগাওয়াটের হিসাবে) | | | |
| বর্জ্য থেকে শক্তি | ১৫.০০ | ০.০০ | ১৬০.১৬ |
| জৈবভর | ৬০.০০ | ০.০০ | ৬৫১.৯১ |
| জৈবভর গ্যাসিফিয়ার | | | |
| গ্রাম | ২.০০ | ০.০০ | ১৮.১৫ |
| শিল্প | ৮.০০ | ০.০০ | ১৬৪.২৪ |
| এরো-জেনারেটরস/হাইব্রিড ব্যবস্থা | ০.৩০ | ০.০০ | ২.৬৯ |
| সৌর ফোটোভল্টেনিক ব্যবস্থা | ১০০.০০ | ২.০৭ | ৩২৫.৪০ |
| ওয়াটার মিল/মাইক্রো হাইড্রেল | ১.০০ | ০.০০ | ১৮.৭১ |
| **মোট** | **১৮৬.৩০** | **২.০৭** | **১৩৪১.২৬** |
| ৩. অন্য নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবস্থা | | | |
| ঘরগেরস্থালির জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট (লক্ষে) | ১.১০ | ০.০০ | ৪৮.৫৫ |

● সৌর পার্ক ও অতি বৃহৎ বিদ্যুৎ :

সৌর পার্কের সাফল্য মনে রেখে আরও ২০,০০০ মেগাওয়াটের সৌর পার্ক-এর অনুমোদন বিবেচনাধীন। নতুন পার্ক গড়ার প্রকল্প অনুমোদিত হলে দেশে মোট ৪০,০০০ মেগাওয়াটের সোলার পার্ক গড়ে উঠবে। এবং সম্ভবত ভারতই হবে সোলার পার্কে বিশ্বের বৃহত্তম। আগেকার কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় রূপে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে।

● প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প :

আরও ৫০০ মেগাওয়াটের প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়।

● সৌর কোষ ও মডিয়ুল নির্মাতাদের জন্য উৎপাদন ভরতুকি :

দেশে ৬৩৭৫ মেগাওয়াটের সৌর কোষ ও ১৫৭৭৫ মেগাওয়াটের সৌর মডিয়ুল নির্মাণের জন্য বর্তমান সৌর উৎপাদকদের উৎপাদন ভরতুকি জোগানের পরিকল্পনা আছে এই কর্মসূচিতে। যেকোনও কর্মসূচির আওতায় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে এই কোষ ও মডিয়ুল সরবরাহ করা হবে। এই কর্মসূচিটি এখন সরকার অনুমোদনের জন্য খতিয়ে দেখছে।

● গ্রিড-সংযুক্ত ছোট সৌর পি ভি বিদ্যুৎ প্রকল্প (১-৫ মেগাওয়াট) :

এই কর্মসূচিতে ১০,০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। কর্মসূচিটি সরকারের বিবেচনাধীন।

## এগোনোর উপায়

গত পাঁচ বছরে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে মোটমাট ৪৬ শতাংশ। ২০১১-১২-তে এই ক্ষমতা ছিল ১,০২৩ মেগাওয়াট। ২০১৫-১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৭৬৩ মেগাওয়াট। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ভারত বিশ্বের শীর্ষ ৬-টি দেশের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছে। ইদানীংকার ধারা বজায় থাকলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ভারত আরও শীর্ষে উঠবে।

ভারতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় বিদ্যুতের এক অগ্রণী উৎস হয়ে উঠতে পারে এদেশ। প্রতিযোগিতা ও সৌর বিদ্যুৎ কারখানার মাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সৌর বিদ্যুতের দাম কমেছে অনেকখানি। দামের নিরিখে চিরাচরিত বিদ্যুতের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে এই সৌর বিদ্যুৎ। রাজস্থানের একটি প্রকল্পে অধুনাতম এক টেন্ডারে দেখা গেল কিলোওয়াট পিছু দাম নেমেছে r ৪.৩৪।

সরকার অনুকূল নীতি চালু করায় টেন্ডারের মাধ্যমে দর প্রতিযোগিতামূলক স্তরে নেমে এসেছে। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়াতে দাম নীতি সংশোধিত হয়েছে। দাম নীতিতে রাজ্যগুলির জন্য সৌর বিদ্যুৎ কেনা বাধ্যতামূলক।

সৌর কোষ ও মডিয়ুল উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগানোর জন্য সরকার উৎপাদন ভরতুকি দেবার কর্মসূচিও নিচ্ছে। এর ফলে আমদানি করা সৌর সাজসরঞ্জামের সঙ্গে দামে এঁটে উঠতে পারবে দেশি সৌর কোষ ও মডিয়ুল। আরও কিছু নতুন উদ্যোগও বিবেচনা করা হচ্ছে।

সহায়ক নীতি ও নিয়ামক কাঠামোর মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়নে সক্রিয় অনেক রাজ্য সরকারও।

১০০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ পূরণ হলে কমবে ১৭ কোটি ৪৮ লক্ষ ২ হাজার টন কার্বন নির্গমন। এক লক্ষ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে কাজের জোগাড় হবে ১০ লক্ষ মানুষের। কর্মসংস্থান ও লগ্নির সুযোগ বাড়ার সুবাদে রোজগার বৃদ্ধি পাবে। আরও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের অর্থ ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে যাবে। দেশে শক্তি নিরাপত্তা ও শক্তির নাগাল পাবার ক্ষেত্রে হবে অগ্রগতি। সৌর যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রেও আসবে জোয়ার। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবাদে চিরাচরিত বিদ্যুতের উপর নির্ভরতা কমবে। এর ফলে কয়লা ও গ্যাস আমদানির প্রয়োজন যাবে কমে। বিদেশি মুদ্রা ভাঁড়ারে জমা বাড়বে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে কর ও শুল্ক বাবদ সরকারের রাজস্ব বেড়ে যাবে। এবং সৌর প্রকল্পগুলি প্রচুর পতিত জমিকে উৎপাদনশীল কাজে লাগাবে।

তবে নতুন প্রকল্পগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রকল্পের নিলাম আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। টান পড়ছে লাভের কড়িতে। আরও বেশি ঝুঁকি নিতে হচ্ছে উদ্যোগীদের। দেশে সৌর কোষ ও মডিয়ুল নির্মাণ বৃদ্ধি এই ঝুঁকি সামাল দিয়ে সরকারের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের কর্মসূচিতে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয়। ❑

---

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য মন্ত্রকের উপদেষ্টা। জৈব-গ্যাস, জৈবভর, সৌরবিদ্যুৎ, বর্জ্য থেকে শক্তি, গ্রামীণ শক্তি সুরক্ষা, সৌর শহর, সবুজ ইমারত এবং দেশে জন সচেতনতা-সহ বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত আছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে 'অক্ষয় ঊর্জা'—পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদক। ইমেল : aktripathi@nic.in)

WBCS Preli ও Main- এ Geography-তে সেরা Guidence এর জন্য পশ্চিমবঙ্গে 1 নং প্রতিষ্ঠান

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের লেখক কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের Guidence-এ Highly Scoring Subject Geography কে Optional হিসাবে নিয়ে নিশ্চিত সাফল্য পান—

**COVERAGE** **Preli**-25-30 Marks, **Main**-Compulsory Geography-(Paper-III) 100 marks & **Optional Georaphy** for Group A & B - 400 marks.

**SPECIALITY :** ● লেখক নিজেই পড়ান ● সিলেবাস ভিত্তিক স্টাডিম্যাট ● প্রতিদিন Class Test ● পরীক্ষার আগে অসংখ্য Mock Test ● মাধ্যম—বাংলা ও ইংরাজী ● পোস্টালের ব্যবস্থা আছে ● 100% Common Suggestion

**N.B.** WBCS এর সম্পূর্ণ Guidence সহ General Combined, BANK, PO, UPSC, SSC, RAIL-এর Guidence এর সেরা প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগঃ

**MONDAL SCHOOL OF COMPETITIVE EXAM**

শিয়ালদহ 21 নং রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলি- 700009, 4র্থ তল, সৃজনী সংঘের পাশে, মোঃ 9836223112

আগস্ট মাসে প্রকাশিত হচ্ছে লেখকের অন্যান্য বই (বাংলায়)

● কমপিটিটিভ ম্যাথ ও জি আই
● কমপিটিটিভ ইতিহাস
● জেনারেল স্টাডিজ

মণ্ডল প্রকাশনী

# বিদ্যুৎ ও শক্তি সংক্রান্ত কয়েকটি মোবাইল অ্যাপ

● **"বিদ্যুৎ প্রবাহ" মোবাইল অ্যাপ**

এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান (সংক্ষেপে অ্যাপ) প্রকৃত সময়ে দেশে শক্তি সরবরাহের বাস্তব চিত্রটির উপর আলোকপাত করে। "বিদ্যুৎ প্রবাহ" মোবাইল অ্যাপ শক্তির বাজার দর, বর্তমান সর্বভারতীয় চাহিদা (গিগওয়াট-এ) এবং সর্বোচ্চ চাহিদা ও মোট শক্তির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ও রাজ্যপিছু ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ড্যাশবোর্ড-এ সংক্ষিপ্তাকারে সর্বভারতীয় সামগ্রিক চিত্র, সর্বভারতীয় মানচিত্রে প্রত্যেক রাজ্যের আলাদা লিঙ্ক ও প্রতিটি ক্লিক-এ সংশ্লিষ্ট রাজ্যভিত্তিক পৃথক পৃষ্ঠা।

ওয়েবসাইট/মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে বর্তমান চাহিদার কতটা পূরণ হল, ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত শক্তির পরিমাণ ও বাজার দর জানা যায়। বর্তমান মুহূর্তের তথ্য জানা যায় ও তার সঙ্গে আগের দিন/বছরের তুলনাও করা যায়। সকলের সুবিধার জন্য রাজ্য ও বাজার-সহ একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য একইসঙ্গে এই একটি পোর্টালে পাওয়া যাবে।

এই অ্যাপ ব্যবহার করা খুব সহজ। ভারতের মানচিত্রের আকারে উপস্থাপনের ফলে উপভোক্তা/অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে সর্বভারতীয় স্তরে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/রাজ্যভিত্তিক পরিষেবার লভ্যতা ও দর জানতে সুবিধা হয়। এই অ্যাপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে উপভোক্তার ক্ষমতায়ন হওয়ায় সব অংশগ্রহণকারীদের দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা বাড়বে এবং এর ফলে দেশে আরও বিনিয়োগ বাড়বে।

এই অ্যাপ প্রধানমন্ত্রী সুশাসনের নীতিরই প্রতিফলন। এর ফলে স্বচ্ছতা আরও বাড়বে ও দেশজুড়ে শক্তি উৎপাদকদের উপর চাপ সৃষ্টি হবে। শক্তিমন্ত্রক আয়োজিত এই অ্যাপ-এর নামকরণের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য https://mygov.in/-এ ১৬০০-টি আবেদন জমা পড়ে। vidyutpravah.in-এর মাধ্যমে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান-টি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অ্যাপ যে কোনও অ্যান্ড্রয়েড বা আই-ফোন-এ বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

● **"সূর্যমিত্র" মোবাইল অ্যাপ**

গ্লোবাল পোজিশানিং সিস্টেম বা জিপিএস-ভিত্তিক এই মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোলার এনার্জি (এনআইএসই), যা কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক (এমএনআরই)-এর আওতাধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

এই অ্যাপ-টি হল একটি উচ্চমানের প্রযুক্তিগত মঞ্চ যা একইসঙ্গে হাজার হাজার অভিযোগ/অনুরোধ সামলাতে সক্ষম। প্রশিক্ষিত "সূর্যমিত্র"-রা (যারা এই উদ্যোগ বেছে নিয়েছে) বিভিন্ন রাজ্যে এই মোবাইল অ্যাপ-এর সঙ্গে যোগদান করেছে। ক্রেতা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ও সময়নিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন করতে এনআইএসই সূর্যমিত্র-দের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এখন তারা পরিষেবা দেবার জন্য প্রস্তুত। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে ৩,২০০ সূর্যমিত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের মধ্যে ৭ হাজার সূর্যমিত্র-কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে।

মোবাইলের এই ধরনের উদ্ভাবনমূলক ব্যবহারের ফলে সোলার (সৌর) পিভি (ফোটোভোলটাইক) প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। এছাড়াও সৌরশক্তিবিষয়ক উদ্যোগপতিদের ব্যবসা বাড়ানোরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। সূর্যমিত্র মোবাইল অ্যাপ বর্তমানে গুগল্ প্লে স্টোর-এ পাওয়া যাচ্ছে এবং তা সারা দেশে যে কোনও জায়গায় ডাউললোড ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক নাবার্ড-এর প্রকল্পের আওতাধীন কয়েক লক্ষ গ্রিড-বহির্ভূত (অফ-গ্রিড) সোলার পিভি ব্যবস্থার দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সূর্যমিত্র মোবাইল অ্যাপ কাজে লাগানো যেতে পারে। মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যে এক লক্ষ সোলার পিভি পাম্প লাগানোর পরিকল্পনা করেছে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের আওতাধীন সৌর পাম্পগুলির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আর মেরামত করার ক্ষেত্রেও এই অ্যাপ কাজে আসবে। ঠিক একইভাবে, বিভিন্ন রাজ্যে পুরানো ও নতুন জলের সৌর হিটার-এর রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রেও সূর্যমিত্র অ্যাপ খুব কাজে লাগবে।

সূর্যমিত্র-রা যাতে তাদের গ্রাহকদের ন্যায্যমূল্যে পরিষেবা প্রদান করেন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোলার এনার্জি তা সুনিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। হাজিরাপিছু সূর্যমিত্র-রা পাবেন ১৫০ টাকা এবং স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত করার ক্ষেত্রে তারা মন্ত্রক নির্ধারিত হারে টাকা পাবেন। সূর্যমিত্র-দের জন্য কর্মসংস্থান ও উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি দেশে সৌরশক্তিচালিত উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও সূর্যমিত্র মোবাইল অ্যাপ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

● **"স্টার রেটিং" মোবাইল অ্যাপ**

"স্টার রেটিং" মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী ক্রয় করার আগে একই শ্রেণির বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উপকরণের (ব্যক্তিগত) তুলনা করে এবং নিমেষের মধ্যে উপভোক্তা ও অন্যান্য অংশীদারদের মতামত জেনে নিয়ে বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গ্রাহকদের জন্য একছত্র সমাধানসূত্র হওয়ার পাশাপাশি, যে কোনও সময়ে সঞ্চিত তথ্য ও বাজারের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার নিরিখে এটি নীতি প্রণেতাদের কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই অ্যাপ যে কোনও অ্যান্ড্রয়েড বা 'আই ও এস' স্মার্টফোনে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

● **"উর্জা" মোবাইল অ্যাপ**

তথ্য-প্রযুক্তি পরিষেবা-ভুক্ত শহরে উপভোক্তাদের বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নতুন সংযোগ, অভিযোগের প্রতিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশান' শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ বণ্টন ক্ষেত্রের জন্য "আর্বান জ্যোতি অভিযান— উর্জা" মোবাইল অ্যাপ বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মানুষকেন্দ্রিক, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি, তথা সুশাসনের নীতিরই প্রতিফলন এই অ্যাপ।

● **"গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ" মোবাইল অ্যাপ**

"গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ" মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরণ প্রক্রিয়ার প্রগতির বাস্তব পরিস্থিতি জানা যাবে। মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টাল, উভয় মারফৎ এই তথ্য প্রদান করা হবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে "গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ" মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করা যেতে পারে।❑

**সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা**

# যোজনা ? ক্যুইজ

১. দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার সূচনা কবে হয়?

২. REC কী?

৩. GVA কাদের বলা হয়?

৪. গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গতি আনতে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ‘পাওয়ার ফোকাস সামিট’-এ একটি মোবাইল অ্যাপ লঞ্চ করা হয়। এর নাম কী?

৫. EESL কী?

৬. ভারত সরকারের আওতাধীন একটি লগ্নিকারী সংস্থা PFC। PFC-র পুরো নাম কী?

৭. মহারত্ন সংস্থা NTPC-র পুরানো নাম কী?

৮. ভারতের অন্যতম জলবিদ্যুৎ নিগম কোনটি?

৯. ২০১৬ সালের ‘ফোর্বস গ্লোবাল টু-থাউসেন্ড’ তালিকায় ৪০০তম স্থান কোন ভারতীয় শক্তি সংস্থা দখল করেছে?

১০. ২০২২ সালের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কত ধার্য করা হয়েছে?

---

**উত্তর :**

১. ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাটনায় এই যোজনার সূচনা করে। ২. ‘রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান কর্পোরেশন’—একটি নব-রত্ন সংস্থা। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের আওতাধীন। ৩. ‘গ্রামীণ বিদ্যুৎ অভিযান্তা’ অর্থাৎ ‘রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান ইঞ্জিনিয়ার্স’। ৪. GARV অ্যাপ। ‘গ্রামীণ বিদ্যুৎ অভিযান্তা’-রা এই অ্যাপ ব্যবহার করেই নিজেদের কাজ করবেন। ৫. ‘এনার্জি এফিশিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড’। ৬. ‘পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন’ লিমিটেড। ৭. ‘ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড’। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে সংক্ষিপ্তকারে নতুন নামকরণ হয়। ৮. NHPC (পূর্বতন ন্যাশনাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন)—একটি ‘মিনি রত্ন’ সংস্থা। ৯. NTPC। ১০. ১৭৫ গিগাওয়াট। পাঁচগুণ বৃদ্ধি।

# যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

## (২১ জুন-২০ জুলাই, ২০১৬)

### আন্তর্জাতিক

● **ব্রেক্সিট-এর পর ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে :**

জিতল 'ব্রেক্সিট'। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ই ইউ) সঙ্গে চার দশক তিন বছরের গাঁটছড়া খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা ব্রেক্সিট-এর (Britain এবং exit মিলিয়ে Brexit) পক্ষে রায় দিয়েছেন। ২৩ জুনের গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেন ৫১.৯ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক। আর ইউনিয়নের সঙ্গে থাকার পক্ষে ৪৮.১ শতাংশ।

সাধারণ মানুষের এই ঐতিহাসিক রায় মাথা পেতে নিয়ে, গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্তের পরই প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। ১৩ জুলাই বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে ক্যামেরন ইস্তফা দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তারই মন্ত্রালয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব থেরেসা মে-কে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আমন্ত্রণ জানান রানি এলিজাবেথ। নব্বইয়ের দশকে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের পদত্যাগের পর ফের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল গ্রেট ব্রিটেন। প্রসঙ্গত, তিরিশ বছর আগে ই ইউ থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল গ্রিনল্যান্ড। আর তার পর ব্রিটেন।

● **ইরাক যুদ্ধ নিয়ে চিলকট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ :**

২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার দোসর হয়ে ইরাকের যুদ্ধে সামিল হয়েছিল ব্রিটেন। যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল কি না—সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বছর সাতেক আগে চিলকট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। গত ৬ জুলাই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। চাপের মুখে এক যুগ পার করে ইরাকের যুদ্ধে ব্রিটেনের ভূমিকা নিয়ে যাবতীয় দায় মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমাও চান ব্লেয়ার।

প্রসঙ্গত, ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেট সাদ্দাম হুসেনের কাছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের বিপুল ভাঁড়ার রয়েছে বলে প্রচার চালিয়েই যুদ্ধের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। অথচ হামলা-পরবর্তী ইরাকে গিয়ে ব্রিটিশ পরিদর্শকরা সেই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস পাননি বলেই জানিয়েছে ১২ খণ্ডে প্রকাশিত চিলকট রিপোর্ট। ইরাক যুদ্ধের ১৩ বছর পর ৬ জুলাই প্রকাশিত চিলকট তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, ইরাক-যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল ব্রিটেনের। চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে কমিটির চেয়ারম্যান জন চিলকট জানান, ইরাককে সেবার শান্তিপূর্ণভাবেই নিরস্ত্র করা যেত। কিন্তু তা না করে, ত্রুটিপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই ইরাকে হামলার সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার।

● **তাইওয়ান-মার্কিন মিসাইল মহড়ার তোড়জোড় :**

সম্প্রতি আমেরিকার কাছ থেকে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড ক্যাপাসিটি-৩ (পিএসি-৩) কিনেছে তাইওয়ান। এই পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া যায়। তাইওয়ানের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক কোনও কালেই মধুর নয়। জন্মলগ্ন থেকেই চিনের কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে তাইওয়ানের বিরোধ রয়েছে। এমনকী, আজও তাইওয়ানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না চিন। দক্ষিণ চিন সাগর ইস্যুতে চিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলে অসন্তোষ তৈরি হওয়ার পর তাইওয়ানও স্বাভাবিকভাবেই চিনের বিরোধী শিবিরেই যোগ দিয়েছে। চিন তাইওয়ানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে একাধিকবার।

চিনা হামলার আশঙ্কার জেরেই আমেরিকার কাছ থেকে পিএসি-৩ অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম কিনেছে তাইওয়ান। এবার সেই পিএসি-৩ মিসাইল সিস্টেমের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তাইওয়ান অবশ্য নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়বে না। আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হবে। হোয়াইট স্যান্ড মিসাইল রেঞ্জ থেকে তাইওয়ানের সেনা ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার এই মহড়া দেবে বলে জানা গেছে।

● **তাসখন্দে মোদী-জিনপিং বৈঠক :**

তাসখন্দে সাংহাই কো-আপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর আলাদা করে বৈঠক হল গত ২৩ জুন। বৈঠকে অবধারিতভাবেই এনএসজি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন ওঠে। প্রেসিডেন্ট জিনপিংকে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে চিন যেন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে, অন্য কোনও দেশের প্রেক্ষিতে যেন ভারতের আবেদনের গুরুত্ব বিচার করা না হয়।

প্রসঙ্গত, বৈঠকে প্রথমেই জিনপিং মোদীকে অভিনন্দন জানান সাংহাই জোটের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য। ভারতের অন্তর্ভুক্তি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও চিনা প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন। তার পরই শুরু হয় এনএসজি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা।

● **উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু সরঞ্জাম বিক্রি করছে পাকিস্তান :**

গোটা বিশ্বে পরমাণু বাণিজ্যের উপর নজর রাখে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। তারাই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার অবৈধ পরমাণু বাণিজ্যের হদিশ পায়। চিনের সংস্থা 'বেজিং সানটেক টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড'-এর তৈরি বেশকিছু পরমাণু সরঞ্জাম উত্তর কোরিয়ার কাছে পাকিস্তান বিক্রি করেছে বলে দাবি মার্কিন গোয়েন্দাদের। 'মোনেল' এবং 'ইনকোনেল' নামে দু'টি সঙ্কর ধাতু ওই

চিনা সংস্থার কাছ থেকে কিনে উত্তর কোরিয়াকে বিক্রি করেছে পাকিস্তান। ওই দুই সঙ্কর ধাতু প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে পারে এবং সহজে ক্ষয় হয় না। পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে ওই ধাতু ব্যবহৃত হয়। মার্কিন গোয়েন্দারা যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, চিনা সংস্থার কাছ থেকে কেনা 'ভ্যাকুয়াম ইনডাকশন মেল্টিং ফার্নেস'-ও উত্তর কোরিয়াকে বিক্রি করেছে পাকিস্তান। পরমাণু বোমা তৈরির মূল উপকরণ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম-এর শুদ্ধিকরণের জন্য এই ফার্নেস ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গত, উত্তর কোরিয়ার উপর বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জের অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে দেশের পরমাণু কর্মসূচিকেও আন্তর্জাতিকমহল অনেক আগেই অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। তাই কোনও পরমাণু শক্তিধর দেশই উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু কর্মসূচির জন্য সরঞ্জাম দেয় না। চিনও নয়। চিনা সংস্থার তৈরি ওই সব সরঞ্জাম পাকিস্তান হয়ে উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছেছে। এই লেনদেনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষেধাজ্ঞা তো লঙ্ঘন করেছেই, এনএসজি সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও পরমাণু সরঞ্জামের গোপন কেনাবেচা চালিয়ে পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ নীতি বিরোধী কাজও করেছে। সব তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে এনএসজি-র সদস্যদের নজরে বিষয়টি এনেছে আমেরিকা।

## জাতীয়

● **ভারত-ইজরায়েল যৌথ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ :**

মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম (এমটিসিআর)-এর সদস্য হওয়ার পর প্রথমবার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল ভারত। ৩০ জুন ওড়িশার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে মাঝারি পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ হয়। ভারত-ইজরায়েল যৌথ উদ্যোগে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রটি চলন্ত লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত হেনেছে বলে প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর। চালকবিহীন বিমানের সাহায্যে আকাশে একটি লক্ষ্যবস্তুকে ওড়ানো হয়। লক্ষ্যবস্তু বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে ধেয়ে আসে। রেডার থেকে সংকেত পেয়ে স্বয়ংক্রিয় মিসাইল সিস্টেম থেকে নিক্ষিপ্ত হয় ক্ষেপণাস্ত্রটি। মাঝ আকাশেই আঘাত হানে লক্ষ্যে।

ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-র অধীনস্থ ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিচার্স ল্যাবরেটরিজ (ডিআরডিএল) এবং ইজরায়েলের সংস্থা ইজরায়েল এ্যারোস্পোস ইন্ডাস্ট্রিজ (আইএআই) যৌথ উদ্যোগে একটি স্বয়ংক্রিয় আকাশসীমা সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। মিসাইল ব্যাটারি ছাড়াও এতে রয়েছে 'মাল্টি ফাংশনাল সারভিল্যান্স অ্যান্ড থ্রেট অ্যালার্ট রেডার' বা এমএফ স্টার। দেশের আকাশসীমায় কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলেই রেডার সঙ্কেত পাঠাতে শুরু করে। সতর্কবার্তা জারি হয়। রেডার সঙ্কেত অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যায় আকাশপথে ধেয়ে আসা বিপদ রুখতে। আকাশপথে হওয়া যে কোনও হামলা রুখতে সক্ষম এই ভূমি-থেকে-আকাশ মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রটি ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারবে।

● **বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত তেজস :**

পয়লা জুলাই ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'তেজস' যুদ্ধবিমান আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হল ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভারতেই তৈরি করা হবে রাশিয়া থেকে আনা মিগ যুদ্ধবিমানের বিকল্প লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফ্‌ট। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সেই নির্মীয়মান যুদ্ধবিমানেরই নাম দেন 'তেজস'। যখন নির্মাণ কাজ শেষ হল, তখন দেখা যাচ্ছে, মিগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ফাইটার জেট তৈরি করেছে অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এডিএ) ও হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)। দেশে তৈরি এই যুদ্ধবিমান বিশ্বখ্যাত ফরাসি যুদ্ধবিমান মিরাজ-২০০০-এর সমমানের।

যে লক্ষ্য নিয়ে ভারত এই লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফ্‌ট তৈরি করা শুরু করেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই লক্ষ্যও বদলেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি, অনেকবার নকশাও বদল হয়েছে এই যুদ্ধবিমানের। ইজরায়েলি মাল্টি-মোড রেডার, ডার্বি আকাশ-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র, অত্যাধুনিক লেসার ডেজিগনেটর এবং টার্গেটিং পড রয়েছে তেজস-এ। কার্বন কম্পোজিট দিয়ে কাঠামো তৈরি হওয়ায় ওজনের দিক থেকেও অত্যন্ত হালকা। প্রতিপক্ষের এলাকায় হানা দেওয়ার পর রেডারে তার হদিশ পেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। ঘণ্টায় ১৭৩০ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারে তেজস। উড়তে উড়তেই মাঝ-আকাশে জ্বালানি ভরতে সক্ষম এই ফাইটার জেট। ওঠানামা করতে সক্ষম খুব ছোট রানওয়ে থেকে।

● **তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সংরক্ষণের আওতায় কেবল বৃহন্নলারাই :**

তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সরকারি সংরক্ষণের আওতায় আসবেন শুধু বৃহন্নালারাই, সমকামী বা উভকামীরা নয়। গত পয়লা জুলাই এই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল, এক ঐতিহাসিক রায়ে বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা দেয় এ দেশের শীর্ষ আদালত। সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য সরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু করতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হতে বলে সর্বোচ্চ আদালত। তারা যাতে সমাজের মূল স্রোতে আসতে পারেন, তার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয় কেন্দ্র ও রাজ্যকে।

সমকামী বা উভকামীরা আদালতের এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হবেন কি না, তা নিয়ে 'ধন্দ' দেখা দেওয়ায় ২০১৪ সালেরই সেপ্টেম্বরে কেন্দ্র জানতে চায়, 'তৃতীয় লিঙ্গ' বলতে শীর্ষ আদালত কাদের নির্দেশ করছে। কারণ, রূপান্তরকামীদের মধ্যে যেমন বৃহন্নলারা আছেন, তেমনই রয়েছেন অনেক সমকামী ও উভকামী। কেন্দ্রের আবেদনের প্রেক্ষিতেই আদালত জানায় সমকামী ও উভকামীরা নয়, সংরক্ষণের আওতায় আসবেন শুধু বৃহন্নলারাই। বিচারপতি এ. কে. সিকরি এবং এন. ভি. রামনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় শুধু বৃহন্নলারাই ওবিসি শ্রেণির সংরক্ষণের অধিকারী।

● **ব্রহ্মস মিসাইল নিয়ে আকাশে সুখোই যুদ্ধবিমান :**

সুখোই থেকে ব্রহ্মস ছোড়ার তোড়জোড় বেশকিছু দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মসকে সুখোই-এর উপযুক্ত করে গড়ে

তোলার জন্য কাজ করছিলেন ব্রহ্মস অ্যারোস্পেস কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা। অন্যদিকে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) সুখোইকে ব্রহ্মস বহণের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছিল। পুরো বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনও (ডিআরডিও)।

ভারত-রুশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের বেগের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি জোরে ছোটে। লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত হানে। পৃথিবীতে এত দ্রুতগামী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আর একটিও নেই। ব্রহ্মসের পাল্লাও অন্যান্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। ন্যাটো বাহিনীর হাতে থাকা টোমাহক এবং হেলফায়ার বা ইজরায়েলের স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী ভারতের ব্রহ্মস। এত ভারী এবং এত বড় পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর কোনও বিমানবাহিনী আজ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেনি। ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই-৩০ এমকেআই ফাইটার জেট গত ২৫ জুন মহারাষ্ট্রের নাসিকে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল) টেস্ট রেঞ্জে ব্রহ্মস নিয়ে আকাশে ওড়ে। রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা ডাবল ইঞ্জিন মাল্টি-রোল ফাইটার জেট সুখোই-৩০ এমকেআই ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বিশ্বের সেরা যুদ্ধবিমানগুলির অন্যতম এই ফাইটার। ব্রহ্মস নিয়ে সফলভাবে আকাশে ওড়ার পর সেই সুখোই আরও অপ্রতিরোধ্য হল বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

● **দেশের তরুণতম মুখ্যমন্ত্রী অরুণাচলের পেমা খাণ্ডু :**

১৬ জুলাই নাবাম টুকি অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হন পেমা খাণ্ডু। তার পরের দিন রাজ্যের দশম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। অরুণাচলের সর্বকনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ৩৭ বছরের পেমা খাণ্ডু। সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দোরজি খাণ্ডুর ছেলে পেমা খাণ্ডু এই মুহূর্তে দেশের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রীও বটে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পর, গত ১৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অরুণাচলে কংগ্রেস-এর নাবাম টুকি-র সরকার পুনরায় ক্ষমতায় ফেরে। ১৬ জুলাই হওয়ার কথা ছিল আস্থাভোট। তবে ভোটের আগেই ইস্তফা দেন টুকি। প্রস্তাবিত হয় খাণ্ডুর নাম। সে দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে অরুণাচলের কার্যনির্বাহী রাজ্যপাল তথাগত রায়ের কাছে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন খাণ্ডু। ২০ জুলাই ৫৮ সদস্যের অরুণাচল বিধানসভায় ২ জন নির্দলীয় বিধায়ক-সহ মোট ৪৬ জনের সমর্থন পেয়ে আস্থা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেন খাণ্ডু।

● **ধর্মীয় পর্যটনের জন্য ১৫০০ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের :**

ধর্মীয় পর্যটন খাতে ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে চলেছে কেন্দ্র। ফোকাস করা হয়েছে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের রামায়ণ সার্কিট, কৃষ্ণ সার্কিট এবং বৌদ্ধ সার্কিট-এ। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, রামায়ণ সার্কিটে অডিও-ভিশুয়াল (দৃশ্য-শ্রাব্য) সিস্টেমের মাধ্যমে অযোধ্যায় শ্রী রামের জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হবে। সঙ্গে থাকবে বাল্মীকি এবং তুলসীদাসের জীবনচরিতও। বৌদ্ধ সার্কিটের আওতায় বিহারে ভগবান বুদ্ধের জীবন কাহিনী নিয়ে একটি থিম পার্ক গড়ে তোলা হবে। আর মথুরা এবং বৃন্দাবনকে ঘিরে তৈরি হবে কৃষ্ণ সার্কিট। এছাড়াও পর্যটক টানতে এই সমস্ত সার্কিটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করা হবে। পর্যটকদের সুরক্ষায় লাগানো হবে সিসিটিভি। থাকছে ওয়াইফাইয়ের সুবিধা এবং গঙ্গার ঘাটের কাছে পোশাক বদলের ঘরেরও ব্যবস্থা করবে পর্যটনমন্ত্রক।

● **অভিন্ন জয়েন্ট এ বছর নয়; রায় শীর্ষ আদালতের :**

চলতি বছর মেডিক্যালে অভিন্ন জয়েন্ট ব্যবস্থা চালু হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে অন্তত এ বছরে রাজ্যগুলির নিজস্ব মেজিক্যাল জয়েন্টের মাধ্যমে পড়ুয়া ভর্তিতে আর কোনও অসুবিধা রইল না। গত ৯ মে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, চলতি বছর থেকেই অভিন্ন জয়েন্টের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করতে হবে রাজ্যগুলিকে। কিন্তু রাজ্যগুলির আপত্তির কারণে ওই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে একটি অধ্যাদেশ আনে কেন্দ্র। যাতে চলতি বছরের জন্য ওই নিয়ম শিথিল করা হয়। এর পর অধ্যাদেশের উপরে স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সেই মামলার রায় দিয়ে ১৫ জুলাই শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা ভেবে কোনও স্থগিতাদেশ আনা হচ্ছে না।

● **সেল্‌ফি-বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী :**

কেন্দ্রীয় সরকারি সমীক্ষা জানাচ্ছে, গোটা পৃথিবীতে ২০১৫ সালে সেল্‌ফি সংক্রান্ত যত মৃত্যু ঘটেছিল, তার প্রায় অর্ধেকই ভারতে। ২৭ জনের মধ্যে ১৪ জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তাদের মতে, 'সেল্‌ফি' তোলাকে ঘিরে এমন উন্মত্ত আচরণ আদতে এক ধরনের মানসিক বিকৃতি। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলি এখনই সতর্ক না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মারফত দেশ জুড়ে চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে। যে কোনও রোগীকে সামান্য সুযোগেই কীভাবে তারা এ নিয়ে সতর্ক করতে পারেন, সে ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছে আইএমএ।

## পশ্চিমবঙ্গ

● **শিক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে বাড়ছে সচেতনতা :**

চতুর্থ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস) থেকে ইঙ্গিত মিলল, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতারও প্রসার ঘটেছে। মেয়েদের শিক্ষার হার যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে উন্নতি হচ্ছে মা ও শিশুর স্বাস্থের নানা সূচকের। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫-'১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। যা ২০০৫-'০৬ সালে ছিল ৫৮.৮ শতাংশ। একই সঙ্গে, প্রতি হাজারে আগে ৪৮ জন শিশু মারা যেত। দশ বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৭। জন্মের নথিভুক্তিও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭ শতাংশ। বছর দশেক আগেও এ রাজ্যে ১৮ বছরের নিচে বিবাহিত মেয়েদের সংখ্যাটা ছিল ৫৩ শতাংশেরও বেশি। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি।

সমীক্ষা বলছে, পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিরোধক ব্যবহারেও মেয়েদের অংশগ্রহণ আগের থেকে বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। তেমন কোনও শর্ত না চাপিয়েও এ রাজ্যে পরিবারপিছু সন্তান সংখ্যা

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা গিয়েছে। এমনকী দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়ও এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উপরে দিকে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ নেওয়ার ঝোঁকও বেড়েছে। প্রায় ৭৫ শতাংশ মহিলাই হাসপাতালে গিয়ে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এমনকী গর্ভাবস্থায় আয়রণ এবং ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট নিয়মিত খাচ্ছেন এরা। শিশুর স্বাস্থ্যেও তার সুপ্রভাব পড়ছে।

● **গৃহস্থ ও কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-সংযোগে সাফল্য :**

গত পাঁচ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও গৃহস্থের ঘরে বিদ্যুৎ-সংযোগের নিরিখে কেন্দ্রের প্রশংসা কুড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে গৃহস্থের বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ-সংযোগ প্রায় ৯৭ শাতংশ বেড়েছে। ২০১১ সালের শেষে রাজ্যে গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৭৪ লক্ষের কিছু বেশি। এখন রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। গত পাঁচ বছরে কৃষিক্ষেত্রেও গ্রাহক-সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৮৫ শতাংশ। তবে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নতুন বিদ্যুৎ-সংযোগের পরিসংখ্যান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। গত পাঁচ বছরে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-সংযোগ বৃদ্ধির হার ২১ শতাংশের কাছাকাছি। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রায় ৫৬ শতাংশ। বাংলায় শুধু সুন্দরবনের ১৪-টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ বাকি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের উদ্যোগে সম্প্রতি গোয়ায় বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ এই তথ্য পেশ করেছে।

● **রাজ্যে বৈদ্যুতিন পণ্যের তালুক নৈহাটি ও ফলতায় :**

অবশেষে বৈদ্যুতিন পণ্য তৈরির দুই শিল্পতালুকের জন্য মূল বিনিয়োগকারী সংস্থা (অ্যাঙ্কর ইনভেস্টর) টেনে আনতে পারল রাজ্য। তাদের লগ্নি প্রতিশ্রুতিতে ভর করে সম্ভব হল কেন্দ্রের কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন আদায় করাও। প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। পরিকল্পনা করা হয়েছিল ফলতায় ৫৮ একর ও নৈহাটিতে ৭০ একর জমিতে তালুক তৈরির। ২০১৪ সালে হাতে এসেছিল প্রাথমিক ছাড়পত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অন্যতম শরিক এ ধরনের তালুক। এখনও পর্যন্ত ৩০-টি তালুক গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। লক্ষ্য, ২০২০ সালের মধ্যে ২০০-টি তালুক তৈরি। প্রসঙ্গত, ফি বছর ২২ শতাংশ হারে বাড়ছে বৈদ্যুতিন পণ্যের চাহিদা। ২০২০ সালে তা ছোঁওয়ার কথা ৪০ হাজার কোটি ডলার।

নৈহাটি ও ফলতার ওই দুই প্রকল্পে মূল লগ্নিকারী হিসেবে টাকা ঢালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজ্যেরই দুই সংস্থা। নৈহাটিতে কস্‌কো কর্পোরেশন, ফলতায় বিক্রম সোলার। বৈদ্যুতিন পণ্য তৈরির দুই শিল্পতালুকে বিনিয়োগের কাথা রাজ্যকে লিখিতভাবে জানিয়েছে তারা। দুই সংস্থাই আগামী তিন বছরে লগ্নি করবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা করে। কস্‌কো তৈরি করবে সেট-টপ বক্স, সার্কিট বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ। বিক্রম সোলারের ব্যবসা মূলত হবে সৌরশক্তিকেন্দ্রিক। কেন্দ্রের নীতি অনুযায়ী এই তালুক (ইলেকট্রনিকস ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার) তৈরির ৫০ শতাংশ খরচ জোগাবে মূল বিনিয়োগকারী সংস্থা আর জমি (৫০ থেকে ১০০ একর) জোগাড় করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই।

## অর্থনীতি

● **৫০০ সংস্থার ডিভিডেন্ড বণ্টন নীতি তৈরি করা বাধ্যতামূলক করল সেবি :**

বাজারে শেয়ার মূলধনের ভিত্তিতে প্রথম ৫০০-টি সংস্থার জন্য ডিভিডেন্ড বণ্টন নীতি তৈরি বাধ্যতামূলক করল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। এই নীতি তৈরি করা মানেই ডিভিডেন্ড দিতে বাধ্য থাকা নয়। তবে এর সাহায্যে কোনও সংস্থার শেয়ার কিনলে কতখানি রিটার্ন আশা করা যেতে পারে, তার ধারণা পাবেন লগ্নিকারীরা। সুবিধা হবে শেয়ার বাছতে।

সেবির নির্দেশ, ওই নীতি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে তাদের বার্ষিক রিপোর্টের আওতায়। তাতে জানাতে হবে—আর্থিক অবস্থা; কী কী কারণে শেয়ারহোল্ডাররা ডিভিডেন্ড আশা করতে পারেন অথবা পারেন না; বাড়তি মুনাফা কী ভাবে ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি। বর্তমানে সব সংস্থার ক্ষেত্রেই আগের ৫ অর্থবর্ষের ডিভিডেন্ড নীতি ও তার হার প্রকাশের নিয়ম চালু রয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

● **সুদের হার ঠিক করতে ঋণনীতি কমিটি :**

এ বার থেকে সুদের হার ঠিক করবে ঋণনীতি কমিটি। ২৮ জুন রিজার্ভ ব্যাংক আইনে সংশোধনী এনে এই প্রক্রিয়া শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ঠিক হয়েছে, রিজার্ভ ব্যাংকের তিনজন সদস্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত তিনজন সদস্যকে নিয়ে ঋণনীতি কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু ভোটাভুটিতে ড্র হলে শেষ কথা বলবেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর।

● **বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ৬,০০০ কোটির প্যাকেজ :**

২৩ জুন বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। যার মধ্যে করছাড়, উৎপাদনে উৎসাহ ভাতা, শ্রম আইন শিথিলের মতো একগুচ্ছ ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ্য, তিন বছরে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান। ১১০০ কোটি ডলারের (৭৩,৭০০ কোটি টাকা) নতুন বিনিয়োগ। তিন হাজার কোটি ডলারের (২,০১,০০০ কোটি টাকা) রফতানি। সামগ্রিক ভাবে রফতানিকে চাঙ্গা করতে বস্ত্রশিল্পকে হাতিয়ার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কারণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বস্ত্র ক্ষেত্রে গত দু'বছরে রফতানি না-বাড়লেও, তেমন কমেওনি।

রাজ্যের করে ভরতুকি ও উৎপাদন খরচে ভরতুকির পাশাপাশি এই বিশেষ প্যাকেজের সব থেকে সাহসী সিদ্ধান্ত হল শ্রম আইন শিথিল করা। শিল্পমহল অনেক দিন ধরেই চাইছিল, সারা বছরের জন্য কর্মী নিয়োগ না-করে নির্দিষ্ট কয়েক মাসের জন্য তাদের কাজে নিতে। যুক্তি ছিল, অনেক বস্ত্রশিল্পেই মরসুম অনুযায়ী উৎপাদন হয়। এবার মন্ত্রিসভা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগে ছাড়পত্র দিয়েছে। তারা অবশ্য স্থায়ী কর্মীদের মতোই বেতন, ভাতা পাবেন। সপ্তাহে সর্বাধিক ৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ওভারটাইমের সময় বাড়ানোরও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কাঁচামালের বদলে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান তৈরির ভিত্তিতে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হবে। সিংহভাগ কাজ মহিলারা পাবেন বলে দাবি করা হয়েছে। কর্মী প্রভিডেন্ট

ফান্ড প্রকল্পে সংস্থাগুলিকে বেতনের ১২ শতাংশ জমা করতে হয়। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত, ১৫ হাজার টাকার কম বেতনের নতুন কর্মীদের জন্য প্রথম তিন বছর সেই দায় পুরোটাই সরকার বহন করবে।

● **স্পেকট্রাম নিলাম :**

২২ জন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৭-টি ব্যান্ডের স্পেকট্রাম নিলামে ছাড়পত্র দিয়েছে। এর ফলে রাজকোষে প্রায় ৫,৬৬ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। চলতি বছরে স্পেকট্রাম নিলামের পরিকল্পনা ছিলই। এ বার তাতে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। গত বছরে স্পেকট্রাম নিলাম থেকে ১.১ লক্ষ কোটি টাকা আয় করেছিল কেন্দ্র। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে নিলাম শুরু হওয়ার কথা।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রক ৭০০, ৮০০, ৯০০, ১৮০০, ২১০০, ২৩০০ ও ২৫০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের ব্লক মিলিয়ে মোট ২৩০০ মেগাহার্ৎজেরও বেশি স্পেকট্রাম নিলাম করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ফোর-জি পরিষেবা সম্প্রসারণে সুবিধা হবে। এ বারই প্রথম ফোর-জি পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় ৭০০ মেগাহার্ৎজ স্পেকট্রামের নিলাম হওয়ার কথা। বিভিন্ন মন্ত্রককে নিয়ে তৈরি গোষ্ঠী যে বিধি অনুমোদন করেছে তাতে ওই ৭০০ মেগাহার্ৎজ স্পেকট্রামের প্রতি মেগাহার্ৎজের ন্যূনতম দর ১১,৪৮৫ কোটি টাকা স্থির করা হয়েছে। টেলিকম শিল্পে এই ব্যান্ড-এর স্পেকট্রামের চাহিদা বেশি। কারণ ২১০০ মেগাহার্ৎজে (থ্রি-জি) পরিষেবা দেওয়ার যা খরচ, ৭০০ মেগাহার্ৎজের ক্ষেত্রে তা ৭০ শতাংশ কম। ৭০০ মেগাহার্ৎজের একটি ৫ মেগাহার্ৎজ 'ব্লক' নিতে হলে টেলি সংস্থাগুলিকে অন্তত ৫৭,৪২৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। শুধু এই ব্যান্ডের নিলাম থেকেই কেন্দ্রের অন্তত ৪ লক্ষ কোটি টাকা আয় হতে পারে।

● **ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকি রুখতে ব্যবস্থা :**

চলতি অর্থবর্ষে ইচ্ছাকৃত করফাঁকি রুখতে প্রয়োজনে গ্রেফতার ও আটকের নির্দেশ দিয়েছিল আয়কর দফতর। কিন্তু তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে আতঙ্ক না-ছড়ায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে তা নিশ্চিত করতে আয়কর দফতর জানিয়ে দিল, আয়কর আইনে গ্রেফতারির বিধান থাকলেও একেবারে বিরল ঘটনাতেই সেই রাস্তায় হাঁটা হবে। ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকি রুখতে প্যান কার্ড বাতিল করে দেওয়া, রান্নার গ্যাসে ভরতুকি বন্ধ করা এবং সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ না-পাওয়ার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। করফাঁকির ঘটনা অর্থ মন্ত্রককে জানাবে আয়কর দফতর। প্যান কার্ড বাতিল হলে ওই ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি কেনাবেচাও সম্ভব হবে না। অপরাধীর নাম ও অন্যান্য তথ্য গোটা দেশের আয়কর দফতরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যাদের ২০ কোটি টাকার বেশি কর বকেয়া রয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করে দেওয়ার কাজ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১ কোটি টাকার বেশি কর বকেয়া হলেই নাম-ধাম প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

● **১৩-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের জন্য ২৩ হাজার কোটি :**

অনুৎপাদক সম্পদের চাপ ও নগদের অভাবে নাজেহাল ১৩-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে ১৯ জুলাই ২২,৯১৫ কোটি টাকা জোগালো কেন্দ্র। লক্ষ্য, দু'দশকের তলানিতে ঠেকা ব্যাংক-ঋণের জোগানকে টেনে তোলা এবং বাজার থেকে তাদের তহবিল জোগাড়ের সুযোগ বাড়ানো। অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই আর্থিক বছরে ব্যাংকগুলিতে মূলধন সরবরাহের এটাই প্রথম কিস্তি। আগামী দিনে ঢালা হবে আরও পুঁজি। তবে তা নির্ভর করবে তাদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, ধার ও জমার অঙ্ক বাড়ানো এবং খরচ কমানোর উপর।

উল্লেখ্য, ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য কেন্দ্রের সাত দফা কর্মসূচির আওতায় ছিল চার বছরে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) ৭০ হাজার কোটি টাকা মূলধন জোগানোর এই প্রতিশ্রুতি। এ বারের বাজেটে যার মধ্যে ২৫ হাজার কোটি বরাদ্দ করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তারই ৯২ শতাংশ ঢালা হল এ দিন। গত পাঁচ বছর ধরে বার্ষিক ঋণের পরিমাণ কোন ব্যাংক কতটা বাড়াতে পেরেছে তা বিচার করেই কার কতখানি মূলধন দরকার, তা স্থির করেছে কেন্দ্র। শর্ত হিসেবে যোগ হয়েছে, কোন ব্যাংকের ধারের পরিমাণ কতটা বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে, তা-ও।

● **২০০-টি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকেও রুপে কার্ড :**

এ বার দেশের ২০০-টি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক বা ডিসিসিবি-র (জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক) গ্রাহকদের জন্য 'রুপে' ডেবিট কার্ড চালু করছে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)। ভিসা বা মাস্টার কার্ডের মতো রুপে-ও লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী মাধ্যম। এনপিসিআই সূত্রে খবর, ৬৭৫-টি জেলার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক, শহুরে সমবায় ব্যাংক এবং শিডিউলড কো-অপারেটিভ ব্যাংকে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যেই রুপে কার্ড দিচ্ছে তারা। ১৯ জুলাই ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশন ডে উপলক্ষে ২০০-টি ডিসিসিবি-তেও পুরোদস্তুর এই পরিষেবা চালুর কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাল এনপিসিআই।

নগদ লেনদেনে রাশ। কালো টাকার লেনদেন আটকানো। আর ব্যাংকিং পরিষেবার সুবিধা সকলের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ডেবিট কার্ড ব্যবহারের প্রসারে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। সেই উদ্যোগের অঙ্গ এই নতুন পদক্ষেপ। স্থানীয় স্তরে আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বিশেষত, কৃষি ও স্থানীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারাই মূল চালিকাশক্তি। যে কারণে এই সব ব্যাংকের গ্রাহকেরা রুপে-ডেবিট কার্ড ব্যবহার করলে, ব্যাংকিং পরিষেবা ছড়াবে। স্বচ্ছ হবে লেনদেন ব্যবস্থাও। এটিএম ছাড়াও, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এনপিসিআইয়ের গাঁটছড়া থাকায়, এই কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটাও করা যাবে। সংস্থা সূত্রের খবর, এখন দেশে প্রায় ২৮ কোটি ব্যাংক গ্রাহক রুপে-ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেন। যার মাধ্যমে ২.২ লক্ষেরও বেশি এটিএম ও ১.২ লক্ষ 'পয়েন্ট অব সেল টার্মিনাল' ব্যবহারের সুবিধা পান তারা।

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **একসঙ্গে ২০-টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে ইসরোর রকেট :**

সফল উৎক্ষেপণ হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' বা 'পিএসএলভি-সি৩৪'-এর।

সঙ্গে নিয়ে যায় মোট ২০-টি কৃত্রিম উপগ্রহ। গত ২২ জুন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সকাল ৯-টার কিছু পরেই উৎক্ষেপণ করা হয় ইসরোর 'পিএসএলভি-সি-৩৪' রকেট। ২৬ মিনিটের মধ্যেই তা পৌঁছে যায় মহাকাশে। এর আগে ২০০৮ সালে একই সঙ্গে মোট ১০-টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ইসরোর রকেট। তবে এ ব্যাপারে 'বিশ্ব রেকর্ড'-টি এখনও রাশিয়ার দখলে। ২০১৪ সালে রাশিয়া একই সঙ্গে ৩৭-টি উপগ্রহ পাঠিয়েছিল মহাকাশে।

উপগ্রহগুলি-সহ মোট ১,২৮৮ কিলোগ্রাম ওজন নিয়ে 'পিএসএলভি-সি-৩৪' পৌঁছে যায় পৃথিবীর মেরু-ঘেঁষা ৫০৫ কিলোমিটার ওপরের কক্ষপথে। যার নাম 'সান সিনক্রোনাস অরবিট' (এসএসও)। আমেরিকার ১৩-টি, কানাডার ২-টি, জার্মানি ও ইন্দোনেশিয়ার ১-টি করে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর পাশাপাশি চেন্নাইয়ের সত্যভামা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুণের কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৈরি দু'টি খুদে উপগ্রহও ছিল রকেটের সঙ্গে। আর রয়েছে গুগলের একটি উপগ্রহও। বিদেশের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো অবশ্য ইসরোর কাছে নতুন কিছু নয়। এ সবের জন্য 'অ্যানট্রিক্স' নামে ইসরোর বাণিজ্যিক শাখাও রয়েছে। এ দিন কার্টোস্যাট-২ নামে যে উপগ্রহটি পাঠানো হয়েছে, তাতে বসানো উন্নত মানের সাদা-কালো এবং রঙিন ক্যামেরা যে সব ছবি পাঠাবে তা দেশের মানচিত্র তৈরি, শহর ও গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পনার কাজ, উপকূলের এলাকা উন্নয়নে এবং দেশের ভৌগোলিক পট পরিবর্তনের গবেষণায় কাজে লাগবে।

● **বিদ্যুৎ উৎপাদনে সোলার পাওয়ার ট্রি :**

এক 'সৌরতরু' বা 'সোলার পাওয়ার ট্রি' তৈরি করেছেন দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএমইআরআই)-এর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট শিবনাথ মাইতির নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীদের একটি দল। তাতে সূর্যের আলো শুষে নেওয়ার জন্য রয়েছে সোলার প্যানেল। একটি গাছ থেকে ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয়। যা থেকে গ্রামে অন্তত ৫-টি বাড়িতে আলো জ্বলতে পারে। সৌর প্যানেলে ধুলোময়লা জমায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যায়। তাই এই গাছে জল ছড়ানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। ৫ কিলোওয়াটের একটি গাছ তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা।

বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল লাগানোর তুলনায় এতে জমি লাগে অনেক কম। ছাদে-উঠোনে-ময়দানে বসালে সোলার প্যানেল অনেকটা জায়গা নিয়ে নেয়। বর্তমান পদ্ধতিতে এক মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করতে জমি লাগে ৫ একর। ১০ হাজার মেগাওয়াটের জন্য ৫০ হাজার একর। 'সোলার পাওয়ার ট্রি' বসাতে মাত্র ৪ বর্গফুট জমি প্রয়োজন। যেসব রাজ্যে জমি পাওয়াই দুষ্কর, সেই সব জায়গায় রাস্তার ধারে, ছাদে বা অন্যত্র অল্প জমিতেই এই নতুন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

● **বৃহস্পতির কক্ষপথ ছুঁল নাসার মহাকাশ যান জুনো :**

পাঁচ বছরের যাত্রা শেষে বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করল নাসার মহাকাশ যান জুনো। সৌরমণ্ডলের উৎস সম্পর্কে তথ্য খুঁজতে ২০১১ সালে ফ্লোরিডা থেকে পৃথিবীর মাটি ছেড়েছিল জুনো। নাসার গবেষক স্কট বল্টন গত ৫ জুলাই জুনোর সাফল্যের কথা জানান। ১১০ কোটি ডলার খরচ করে এই মহাকাশযানটিকে বানানো হয়েছে বলে নাসা সূত্রের খবর। পাঁচ বছরে ২৭০ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে জুনো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জুনোর গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে তাকে বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ বলয়ের আওতায় নিয়ে যাওয়াই ছিল অন্যতম চ্যালেঞ্জ। হিসেবে সামান্য ভুলচুক হলে কক্ষপথে না-ঢুকে মহাশূন্যে হারিয়ে যেত জুনো।

এর আগে, ১৯৮৯ সালে বৃহস্পতিতে মহাকাশযান গ্যালিলিও পাঠিয়েছিল নাসা। ২০০৩ সালে গ্যালিলিও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ১৩ বছর পর জুনোই প্রথম উঁকি দিল বৃহস্পতির কক্ষপথে। রোমান দেবতা জুপিটারের নাম অনুসারে ইংরেজিতে বৃহস্পতি গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে 'জুপিটার'। আর 'জুপিটার'-এর স্ত্রী 'জুনো'-র নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছে মহাকাশ যানটির। ডিম্বাকার কক্ষপথে বৃহস্পতিকে ঘিরে একবার পাক খেতে পৃথিবীর হিসেবে জুনোর চোদ্দো দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে নাসা। ঘুরতে ঘুরতে বৃহস্পতির বিপুল চৌম্বক ক্ষেত্র, মাটির গঠন, জলের চিহ্ন আছে কি নেই—প্রায় দু'বছর ধরে বৃহস্পতিকে ঘিরে এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে সে। পাক খেতে খেতেই বৃহস্পতির বিভিন্ন অংশের ছবিও পাঠাতে থাকবে। নাসার দাবি, জুনো গ্যালিলিও-র চেয়ে আরও অনেক কাছ থেকে বৃহস্পতি সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে পারবে।

● **এক বছরে রাজ্যে ২৬-টি নয়া প্রজাতির সন্ধান :**

ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ বা জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া—জেডএসআই-এর দাবি, গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে বিভিন্ন প্রাণীর মোট ২৬-টি নয়া প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। মাছেরই ছ'টি। মাকড়সা-বোলতার মতো কীটপতঙ্গ, ফিতাকৃমির মতো পরজীবীর অচেনা জ্ঞাতিগুষ্টিরও দেখা মিলেছে। গত এক শতকে বিভিন্ন প্রাণীর অন্তত ১১ হাজার প্রজাতির হদিস মিলেছে এই রাজ্যে। নেপথ্যে এ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের ভূমিকা দেখছেন প্রাণী-বিজ্ঞানীরা। তাদের ব্যাখ্যা, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে খাড়া হিমালয় পর্বত, যা কার্যত জীব-বৈচিত্র্যের খনি (বায়োলজিক্যাল হটস্পট)। দক্ষিণে সমুদ্র ও খাঁড়ির পাশাপাশি হরেক কিসিমের জীবজন্তু, পোকা-মাঁকড়ে ভরপুর ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। গঙ্গা-দামোদরের মতো নদীগুলি নানারকমের মাছ ও জলজ প্রাণীর আঁতুড়ঘর। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের রুক্ষ মালভূমিও আছে। এ হেন ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সুবাদেই এ রাজ্যে জীব-বৈচিত্র্যের সমাহারও বেশি।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন, নিত্যনতুন প্রজাতি আবিষ্কারের তাৎপর্য প্রভূত। এদের অস্তিত্ব এতদিন অজানা থাকায় পরিবেশে তাদের গুরুত্বও জানা নেই। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রজাতিরা পরিবেশ এবং বাস্তুতান্ত্রিক গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। তবে সঙ্গে আছে উদ্বেগের ছোঁয়াও। জীব-বৈচিত্র্যের উপরে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু বদলের কুপ্রভাব নিয়ে প্রাণী সর্বেক্ষণের কর্তারা বিলক্ষণ চিন্তিত। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রাথমিকভাবে হিমালয় অঞ্চলকে বাছা হয়েছে। দেখা হবে, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে কোনও প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল কি না। কিংবা অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কোনও প্রজাতি অন্য জায়গা থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে কি না। প্রাণীকূলের বংশলতিকায় যোগ-বিয়োগের ছবিটা তখনই পরিষ্কার হবে।

## প্রয়াণ

● **মহম্মদ শাহিদ :**

গত ১৯ জুলাই গুরুগ্রাম (গুড়গাঁও)-এর একটি হাসপাতালে মারা গেলেন ভারতীয় হকির অন্যতম সেরা ড্রিবলার মহম্মদ শাহিদ। বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। বেশ কয়েক মাস ধরে লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল বারাণসীতে জন্ম ও ১৯ বছর বয়সে জাতীয় দলের হয়ে জুনিয়র পর্যায়ে অভিষেক। মাঝ মাঠে জাফর ইকবালের সঙ্গে শাহিদের জুটি ছিল সুবিখ্যাত। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে ভারতের যে হকি দল সোনা জিতেছিল, শাহিদ ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। অসাধারণ ড্রিবলিং করতেন। ১৯৮২ সালে দিল্লি এশিয়াড এবং ১৯৮৪ সালে সিওল এশিয়াডের রুপো এবং ব্রোঞ্জ জয়ী জাতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৮৫-'৮৬ সালে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন শাহিদ। ১৯৮১ সালে অর্জুন পুরস্কার এবং ১৯৮৬ সালে পদ্মশ্রী সম্মান পান তিনি।

● **অমল দত্ত :**

গত ১০ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যু হল ভারতীয় ফুটবলের প্রথম পেশাদার কোচ অমল দত্তের। তিন প্রধান ছাড়াও টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে শুরু করে ডেম্পো, বিএনআর, টাইটানিয়াম, ভ্রাতৃ সংঘ, চার্চিল ব্রাদার্স, ইউনাইটেড স্পোর্টস—পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতের নানা ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। ৩৭-টা ট্রফি জিতেছেন সব মিলিয়ে। জাতীয় কোচ হয়ে জিতেছেন সাফ কাপ। অমল দত্তের কোচিং কেরিয়ারের অন্যতম বড় ঘটনা সাতানব্বইয়ের ফেড কাপ সেমিফাইনালের ডার্বি। সেবার মোহনবাগানের কোচ হয়ে আমদানি করেছিলেন ডায়মন্ড সিস্টেম। যা আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে।

● **আব্বাস কিয়ারসতমি :**

৫ জুলাই গ্যাসট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ইরানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আব্বাস কিয়ারসতমি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মার্চ মাস থেকে প্যারিসের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরানীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অসাধারণ সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ করেছিলেন তিনি। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সারা বিশ্বের বিনোদনমহল। নিজের দেশ ইরান এবং ইরানীয় ছবিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার পিছনে প্রধান কারিগর ছিলেন তিনিই।

১৯৪০ সালে তেহরানে জন্মেছিলেন আব্বাস। ইউনিভার্সিটি অব তেহরানে পেইন্টিং নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। সেই সময় ছোট পর্দার জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপনের কাজ করেন। ১৯৭০ সাল থেকে ধীরে ধীরে হাত পাকান বড় পর্দার কাজেও। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য ব্রেড অ্যান্ড অ্যালে' ছিল মাত্র ১২ মিনিটের। ১৯৭০ সালে সেই শুরুর দিনটা থেকে ১৯৯৭ সালে 'টেস্ট অব চেরি'-র জন্য 'কান'-এ পাম ডি'ওর পুরস্কার জেতা পর্যন্ত পেয়েছেন আরও হাজারও সম্মান আর পুরস্কার। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে 'সিলভার লায়ন', লোকার্নো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে 'গোল্ড লেপার্ড অফ অনার', ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ফেলোশিপ, ইউনেসকোর 'ফেডেরিকো ফেলিনি গোল্ড মেডেল' দেশ-বিদেশের এমনই নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন কিয়ারসতমি।

● **কে. জি. সুব্রমনিয়ন :**

গত ২৯ জুন গুজরাতের বডোদরার বাড়িতে জীবনাবসান হয় শিল্পী কে. জি. সুব্রমনিয়নের। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। অবন ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পর কে. জি. সুব্রমনিয়নই সেই বিরল শিল্পী, যিনি ছবি আঁকার পাশাপাশি ছোটদের জন্য "ছবি লিখেছেন ও গল্প এঁকেছেন"। লিখেছেন শিল্প নিয়ে প্রবন্ধ, তৈরি করেছেন কাঠ ও ধাতুর কুটুমকাটামে অজস্র ভাস্কর্য-অবয়ব, ডিজাইন করেছেন টেক্সটাইলস। সমান তালে করে গিয়েছেন শিক্ষকতাও।

১৯২৪ সালে কেরলের এক তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে পড়তে গান্ধীর ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছ' মাসের জেল। তত দিনে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন তিনি। অতঃপর নন্দলাল বসুর ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র হওয়া। শিক্ষক হিসেবে আরও পান বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজকে। এর পরে ষাটের দশকে নিজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন বডোদরায়। আটের দশকে ফেরা তাঁর শিক্ষাজীবনের কলাভবনে; সেখানেই আমৃত্যু 'প্রফেসর এমেরিটাস'।

● **এলি উইজেল :**

গত ২ জুলাই ম্যানহাটনে ৮৭ বছর বয়সে মারা গেলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী এলি উইজেল। জার্মানির বুখেনওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কিশোর বয়সে যে ভয়ঙ্কর দিনগুলো কাটিয়েছেন, তা-ই উঠে এসেছিল তাঁর স্মৃতিকথা 'নাইট'-এ। ইহুদি নিধনকে বর্ণনা করতে হলোকস্ট শব্দটি যাঁরা প্রথম ব্যবহার করতে শুরু করেন, এলি তাঁদের অন্যতম। ১৯৫৫ সালে লেখা এই বই আর পাঁচ বছরের মাথায় তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে এলি উইজেলকে চিনেছিল সারা পৃথিবী। রোমানিয়ার সিঘেট শহরে এলির জন্ম ১৯২৮-এ। ১৯৪৪ সালে এলির পরিবারকে পাঠানো হয় আউশউইৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। এলির সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা-মা এবং তিন বোন। বাবা, মা এবং এক বোন শেষ অবধি মারা যান। এলি আর তাঁর বাবাকে আউশউইৎস থেকে বুখেনওয়াল্ডে পাঠানো হয়েছিল। সেখান এলির চোখের সামনেই নাৎসিরা তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই ঘটনার তিন মাস পরে মুক্ত হয় বুখেনওয়াল্ড। ২০০৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে এলি একবার ফিরে গিয়েছিলেন সেই ক্যাম্পে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, নাটক—লিখেছেন অনেক। হলোকস্ট নিয়ে তাঁর ৫০-টিরও বেশি বই। ১৯৬৩ সালে মার্কিন নাগরিক হন। পেয়েছিলেন কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেলও। ১৯৮৬ সালে এলি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

## খেলা

● **ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন কোচ অনিল কুম্বলে :**

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক বোর্ড বিসিসিআই ও তিন সদস্যের ক্রিকেট অ্যাডভাইসরি কমিটি অনিল কুম্বলকে ভারতীয় দলের নতুন প্রধান কোচ মনোনীত করেছে। এই উপদেষ্টা কমিটিতে ছিলেন শচীন

তেণ্ডুলকর-সৌরভ গাঙ্গুলি-ভিভিএস লক্ষ্মণ। নিজের প্রাক্তন সতীর্থদের সামনেই প্রেজেন্টেশন দিতে হয়েছিল ভাবি কোচকে।

অনিল কুম্বলের জন্ম ১৯৭০ সালের ১৭ অক্টোবর। ক্রিকেট মহলে তার ডাকনাম ছিল 'জাম্বো'। ডানহাতি লেগ স্পিন (লেগ ব্রেক গুগলি) বোলার হিসাবে তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৬১৯-টি উইকেট নিয়েছেন। তাকে ১৯৯৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার'-এর সম্মান দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে একই ইনিংস-এ একাই ১০ জন ব্যাটসম্যানের উইকেট নেন কুম্বলে। এই বিরল কীর্তি তিনি ছাড়া একমাত্র অর্জন করতে পেরেছেন ইংল্যান্ডের জিম লেকার। ২০০৫ সালে কুম্বলে পদ্মশ্রী-তে ভূষিত হন। ১৮ বছর খেলার পর, ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক পর্ষদ আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির প্রধান নিযুক্ত হন। তাকে আইপিএল-এ রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও পরবর্তীকালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে মেন্টরের ভূমিকাতেও দেখা যায়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে আইসিসি-র 'হল অফ ফেম'-এ চতুর্থ ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে স্থান দেওয়া হয়।

● **কোপা আমেরিকা সেন্টেনারিও জিতল চিলি :**

জুন মাসের ৩ থেকে ২৬ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হয় 'কোপা আমেরিকা সেন্টেনারিও' আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। CONMEBOL (দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন) ও CONCACAF (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান ফুটবল কনফেডারেশান) কোপা আমেরিকা-র শতবর্ষ উপলক্ষে এই প্রথমবার দক্ষিণ আমেরিকার বাইরে কোনও দেশে এই প্রতিযেগিতার আয়োজন করল। ১৯১৬ সালে সূচনার পর থেকে, এটি ছিল কোপা আমেরিকার ৪৫-তম আসর। কোপা আমেরিকা সাধারণত চার বছর অন্তর আয়োজিত হয়, কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হল। এই বিশেষ সংস্করণে ১২-টির বদলে ১৬-টি দল অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশান-এর সব ক'টি দল-সহ উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান ফুটবল কনফেডারেশান-এর ৬-টি দল ভাগ নেয় এবার। ২০১৫ সালের কোপা আমেরিকা জয় করার পর পরই এই বিশেষ সেন্টেনারিও কাপও জিতে নিয়ে চিলি, টানা দু'বার কোপা বিজয়ী উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সাথে এক পংক্তিতে নিজের নাম লিখিয়ে নিল। ফাইনালে তারা হারায় আর্জেন্টিনাকে। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ (জার্মানির কাছে) ও ২০১৫ সালের কোপা আমেরিকা (সেই বারও চিলির কাছে)-সহ এই নিয়ে পর পর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যুর্নামেন্টের ফাইনালে হারল আর্জেন্টিনা।

● **প্রথমবার ইউরো সেরা পর্তুগাল :**

গত ১০ জুন থেকে ১০ জুলাই ফ্রান্সে 'ইউনিয়ান অফ ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানস্ (UEFA) ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ' বা ইউরো-র ১৫তম আসর বসে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই ট্যুর্নামেন্টের মূল পর্বে ১৬-টি দল অংশগ্রহণ করত। এইবার প্রথম, ২৪-টি দল খেলার সুযোগ পেল। ২০০৮ ও ২০১২ সালের চ্যাম্পিয়ন স্পেন ছিটকে যায় অনেক আগেই। ফাইনালে 'এক্সট্রা টাইম'-এ এডারের ১ গোলের দৌলতে পর্তুগাল আয়োজক ফ্রান্সকে হারায় ১-০ গোলে। এই প্রথমবার ইউরো জিতল পর্তুগাল। এই জয়ের উপর ভিত্তি করে পর্তুগাল ২০১৭ সালে রাশিয়ায় কনফেডারেশানস্ কাপ-এ অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

● **উইম্বলডন, ২০১৬ :**

'অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব' ও আন্তর্জাতিক টেনি ফেডারেশান-এর উদ্যোগে ২৭ জুন থেকে ১০ জুলাই লন্ডনের উইম্বলডনে 'অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকে ক্লাব'-এ আয়োজিত হল উইম্বলডন গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ১৩০তম আসর। এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর, ডব্লিউটিএ ট্যুর, আইটিএফ জুনিয়ার ট্যুর ও এনইসি ট্যুর-এর অংশ এই প্রতিযোগিতা। এটি ঘাসের কোর্ট-এ খেলা হয়। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টে স্টেফি গ্রাফের ২২-টি সিঙ্গলস খেতাবের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন সেরেনা উইলিয়ামস। তৃতীয় রাউন্ডে স্যাম কেরের কাছে হেরে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ান নোভাক জোকোভিচের একটানা ৩০-টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ জেতার ধারার অবসান ঘটল। অন্যদিকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যেতে হল সানিয়া মির্জা-মার্টিনা হিঙ্গিস জুটিকে।

**কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচের ফলাফল**

- পুরুষদের সিঙ্গলস—যুক্তরাজ্যের অ্যান্ডি মারে হারালেন কানাডার মিলোস রাওনিচ-কে।
- মহিলাদের সিঙ্গলস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরেনা উইলিয়ামস হারালেন জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক কের্বের-কে।
- পুরুষদের ডাবলস—পিয়ের-হিউস হারবার্ট ও নিকসাল মাহুত হারালেন জুলিয়েন বেনেতো ও এদোর্দ রজার-ভ্যাসসেলিন-কে (সকলেই ফ্রান্সের)
- মহিলাদের ডাবলস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরেনা উইলিয়ামস ও ভেনাস উইলিয়ামস হারালেন হাঙ্গেরির টিমে বাবোস ও কাজাখস্তানের ইয়ারোস্লাভা শ্বেভেদোভা-কে।
- মিক্সড ডাবলস—ফিনল্যান্ডের হেনরি কন্টিনেন ও যুক্তরাজ্যের হেদার ওয়াটসান হারালেন কলম্বিয়ার রবার্ট ফারাহ ও অ্যানা-লেনা গ্রঁনেফেল্ড-কে।

● **লোঢা কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় :**

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক বোর্ড সংক্রান্ত নানা বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য লোঢা কমিশনকে নিয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের তিন সদস্য—সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আর এম লোঢা, প্রাক্তন বিচারপতি অশোক ভান এবং প্রাক্তন বিচারপতি আর রবীন্দ্রনের প্রায় সবক'টি সুপারিশই মেনে নিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। মোট ১৫৯ পাতার রিপোর্টে বেশ কিছু বৈপ্লবিক সুপারিশ করেছিল কমিশন। লোঢা কমিশনের সুপারিশ মেনে গত ১৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এবার থেকে কোনও মন্ত্রী, আমলা বা সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)-এর কোনও পদে থাকতে পারবেন না। এই রায় দেওয়ার পর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ; আগামী ছ' মাসের মধ্যে এই নিয়ম কার্যকরী করতে হবে।

এদিন প্রধান বিচারপতি টি. এস. ঠাকুর ও প্রধান বিচারপতি ইব্রাহিম কলিফুল্লাহের বেঞ্চ জানিয়েছে, মন্ত্রী, আমলা বা সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিদের জন্য বোর্ডের প্রশাসনিক দরজা বন্ধ করার পাশাপাশি মোট নয় বছর বা তার বেশি সময় ধরে পদাধিকারীদেরও এবার আর ঠাঁই মিলবে না বোর্ডে। পাশাপাশি, বিসিসিআই-এর ম্যানেজিং কমিটিতে থাকবেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) মনোনীত এক ব্যক্তি। এছাড়া, কমিশনের 'এক রাজ্য, এক ভোট'-এর সুপারিশেও সায় দিয়েছে আদালত। তবে মহারাষ্ট্রের তিনটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেকটিই পালা করে একবার ভোট দিতে পারবে। রাজ্য ছাড়া অন্য ক্রিকেট সংস্থার ভোটাধিকারের বিলোপ ঘটানো হয়েছে।

● **দেশের প্রথম 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস জিমন্যাস্ট' দীপা কর্মকার :**

২০১৫ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর গ্লাসগোতে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফলের বিচারে সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস জিমন্যাস্ট'-এর সম্মান পেলেন আগরতলার দীপা কর্মকার। এই প্রতিযোগিতায় তিনি পঞ্চম হয়েছিলেন। সেরা ৩০ জনকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 'জিমন্যাসটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'-র কাছে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট ই-মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক জিমন্যাসটিক ফেডারেশন। আর বিশ্ব জিমন্যাস্টিক ফেডারেশনের এই বার্তাই ভারতীয় জিমন্যাসটিক্সকে পৌঁছে দেয় একটা নতুন উচ্চতায়। অতীতে এমন সম্মান পাননি কোনও ভারতীয় জিমন্যাস্ট। বিশ্বমানের জিমন্যাস্ট হয়ে নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও সেই বিরল সম্মান এনে দিলেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার।

● **বিদেশি টি-২০ দলে প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার :**

প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে বিদেশি টি-২০ দলে সই করে নজির গড়লেন হারমানপ্রীত কৌর। মেয়েদের বিগ ব্যাশ টুর্নামেন্টে ভারতের এই অলরাউন্ডার খেলবেন সিডনি থান্ডার টিমের হয়ে। যারা টুর্নামেন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ১৯৮৯ সালের ৮ মার্চ হারমানপ্রীত কৌর ভুল্লরের জন্ম হয় পাঞ্জাবের মোগায়। ২০ বছর বয়সে ২০০৯ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক দিবসীয় ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক হয়। সেই বছরই জুন মাসে টি-২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক হয়। মোট ২-টি টেস্ট, ৪৯-টি এক দিবসীয় ম্যাচ ও ৫৩-টি টি-২০ ম্যাচে তিনি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এছাড়াও ২০১২ সালের টি-২০ এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচ-সহ একাধিকবার ভারতীয় দলের অধিনায়কেরও দায়িত্ব পালন করে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন তিনি। দলে তিনি মূলত ডানহাতি ব্যাটসম্যান। পাশাপাশি ডান হাতে মিডিয়াম ফাস্ট বোলিংয়েও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন হারমানপ্রীত কৌর ভুল্লর।

## বিবিধ

● **ভারতীয় রেলের টালগো দৌড়বে ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগে :**

মথুরা-পালওয়াল রুটে পরীক্ষা করা হয় ভারতীয় রেলের সবচেয়ে গতিশীল ট্রেনটিকে। গতিমান এক্সপ্রেস ছোটে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার বেগে। ১৩ জুলাই তাকেও টপকে ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগে দৌড়ল টালগো। মাত্র ৩৮ মিনিটে ৮৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে স্প্যানিশ সংস্থার তৈরি টালগো।

উল্লেখ্য, ট্রায়ালের পঞ্চম দিনে মথুরা থেকে পালওয়াল পর্যন্ত ৮৪ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে মাত্র ৩৮ মিনিটে। যদিও প্রথম দিন টালগোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। এর পর প্রতি দিন ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার করে বাড়ানো হয় টালগোর গতি। ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগে দৌড়তে সক্ষম হলেও এবার আরও একটি পরীক্ষা দিতে হবে টালগোকে। রেল কর্তৃপক্ষ জানান, মাল ভর্তি করে টালগোর গতি চেক করা হবে। বাঁক নেওয়ার সময় ট্রেনের অবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

● **বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলের তালিকায় 'মিশ্র' শ্রেণিতে ভারতের স্থান :**

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় নালন্দা মহাবিহার, কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান ও চণ্ডীগড়ের ক্যাপিটল কমপ্লেক্স-এর নাম যুক্ত হল। উল্লেখ্য, ভারতে এই প্রথম একাধারে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী কোনও জায়গা ইউনেস্কোর এই তালিকায় জায়গা করে নিল—'মিশ্র' তালিকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানই প্রথম ভারতীয় স্থল। ভারতে মোট ২৫-টি 'সাংস্কৃতিক' স্থান ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় আছে।

অনন্যতা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানকে তাদের ঐতিহ্যের তালিকায় রাখার জন্য গত বছর অক্টোবরেই ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন মনুমেন্টস সাইটস ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার সুপারিশ করেছিল ইউনেস্কোর কাছে। বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে অনেক পৌরাণিক গল্প জড়িয়ে রয়েছে। আর এর চারপাশে রয়েছে সব রকম প্রাকৃতিক উপাদান (হ্রদ, গুহা, নদী)। সিকিমের মানুষ এই সবের পুজো করেন। ওই সব গল্প কাহিনী এবং প্রথা বৌদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশেষ এই চরিত্রে জন্য এখানকার উদ্যান বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী 'মিশ্র' স্থলের তালিকায় জায়গা করে নিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার এই উদ্যান জাতীয় স্বীকৃতি পায় ১৯৭৭ সালে। শুরুতে প্রায় ৮৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গা নিয়ে উদ্যানের সীমা ছিল। পরবর্তীকালে এর আয়তন বেড়ে হয় ১৭৮৪ বর্গকিলোমিটার, যা সিকিমের ২৬ শতাংশ। কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং আশপাশের বিভিন্ন শৃঙ্গ এই উদ্যানের নানা জায়গা থেকে দেখা যায় বলে পর্যটনের দিক থেকেও এই উদ্যান গুরুত্বপূর্ণ।❑

**সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

*(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)*

# ইন্ডিয়া স্কিলস্ : নতুন পদক্ষেপের সূচনা

গত ১৫ জুলাই, ইন্ডিয়া স্কিলস্ কর্মোদ্যোগের প্রথম বর্ষপূর্তির দিনে তথা বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি "ইন্ডিয়া স্কিলস্ প্রতিযোগিতা"-র প্রথম সংস্করণের সূচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ২.০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ভারত আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র বা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টারস্, 'ইন্ডিয়া স্কিলস্ অনলাইন' ও শ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি তথ্য ব্যবস্থা 'লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশান সিস্টেম' (এলএম আইএস)—কেন্দ্রীয় দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগমন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অন্ত্রপ্রেনরশিপ) এই পাঁচটি নতুন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে।

আগামী ৪ বছরে (এপ্রিল ২০১৬-মার্চ ২০২০) ১ কোটি যুবদের প্রশিক্ষিত করতে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য ১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছর (২০১৫-'১৬) এই যোজনার প্রথম অধ্যায়ে প্রায় ২০ লক্ষ যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, সব ক'টি মন্ত্রক মিলিয়ে মোট প্রশিক্ষণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪ লক্ষে।

এই বছররের মধ্যেই ৫০-টি ভারত আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র বা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টার খোলা হবে। প্রথম পর্যায়ে, গৃহকর্ম, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খুচরো বিক্রয়, সুরক্ষা, মূলধনী পণ্য, মোটর গাড়ি, নির্মাণ এবং পর্যটন ও আতিথেয়তা ক্ষেত্রের জন্য রাষ্ট্রপতি ১৫-টি কেন্দ্রের সূচনা করলেন। এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন করবে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন—এনএসডিসি) এবং এগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুবদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ও প্রবাসী কৌশল বিকাশ যোজনা বাস্তবায়িত হবে। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে বিদেশমন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স—এমইএ) বিদেশি ভাষা ও প্রচলিত আদপ-কায়দা-সহ প্রয়োজনীয় প্রাক্-যাত্রা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রথম ১৫-টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬-টি স্থাপিত হবে উত্তরপ্রদেশে ও ২-টি কেরালায়। ঝাড়খণ্ড, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ/তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে হবে একটি করে কেন্দ্র।

ভারতীয় দক্ষতা বিকাশ বাস্তুতন্ত্রে চাহিদা ও জোগানের ধারা সংক্রান্ত তথ্য একত্রিত করতে একটি এক-জানালা মঞ্চ, শ্রম ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা 'লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশান সিস্টেম' (এলএমআইএস—www.lmis.gov.in)-এরও সূচনা করা হয়। শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার জন্য আন্তর্জাতিক মান ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির অনুকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া ও তথ্য ব্যবস্থাসমূহের সমন্বিত রূপ হল 'এলএমআইএস'।

প্রযুক্তির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর কাছে তাদের পছন্দসই বিষয়/ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে মন্ত্রক 'ইন্ডিয়া স্কিলস্ অনলাইন' (www.indiaskillsonline.com)-এরও সূচনা করেছে। অনলাইন (ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে) প্রশিক্ষণের সূচনার মাধ্যমে আজ গোটা দেশই একটি সম্ভাব্য শ্রেণিকক্ষে পরিণত হল। দক্ষতা প্রশিক্ষণের সব প্রার্থীকেই মৌলিক ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে 'ইন্ডিয়া স্কিলস্ অনলাইন' ডিজিটাল বৈষম্য (ডিভাইড) হ্রাস করবে। এভাবেই তারা আরও বেশি সচেতন ও আধুনিক যুগের কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

'ইন্ডিয়া স্কিলস্ কম্পিটিশান' কেন্দ্রীয় দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগমন্ত্রক এবং জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম আয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিযোগিতা। 'ইন্ডিয়া স্কিলস্'-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিরা ২০১৭ সালে আবু ধাবিতে দ্বিবার্ষিক বিশ্ব দক্ষতা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা (ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশান)-য় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

August, 2016
R.N.I. No. 19740/69

# Subscription Coupon

**[For New Membership / Renewal / Change in Address]**

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs.610/-

DD/MO No. _____ Date _____

**Name (in block letters)** _____

**Category** Student / Academician / Institution / Others

**Address** _____

_____

**PIN** ☐☐☐☐☐☐

**Phone** _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

# ATTENTION PLEASE

*The DD/MO should be drawn in favour of :*

The Editor

**Dhanadhanye (Yojana - Bengali)**

*Publications Division*

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।